বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ক দ্বিমাসিক

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পরিবেশ নিয়ে বাড়াবাড়ি কেন

একটি নতুন জীবনচর্চা

কারিগরী শিক্ষার দিশা

প্রয়াত রিচার্ড ফাইনম্যান

সাপে কাটলে কি করবো

বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত — দ্বাদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা জুলাই-আগস্ট 1988 — দাম দু'টাকা

জুলাই-আগস্ট 1988 দ্বাদশ বর্ষ ☐ প্রথম সংখ্যা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

এই সংখ্যার বিষয়

1 বি-ও-বি'র কথা

2 ভূপালের রিজিওনাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি কি বন্ধ হচ্ছে
☐ সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

3 বাড়াবাড়ি—দুনিয়া জুড়ে
☐ রবীন চক্রবর্তী

7 জনবিজ্ঞান : একটি নতুন জীবনচর্চা
☐ প্রদীপ দত্ত

9 কারিগরী শিক্ষা : দিশার সন্ধানে
☐ কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

14 ইন্দিরা সাগর প্রকল্প—বিশ্লেষণ ও বিরোধিতা
☐ CAISA

15 'উই লাভ ইউ ডিক'—প্রয়াত রিচার্ড ফাইনম্যানের প্রতি
☐ সুব্রত ভট্টাচার্য

॥ গণবিজ্ঞান ॥

17 স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অনুসন্ধিৎসা জাগানোর প্রয়াস

18 চুঁচুড়ায় বিজ্ঞান ক্লাবের বারো বছর
☐ ধ্রুবজ্যোতি দে

20 সাপে কাটলে কি করবো : একটি বিতর্ক
☐ সুদীপ্ত সরস্বতী

23 চিঠিপত্র
- যদি 'ক্রমশই বিভ্রান্ত লাগে'…
- ফুকুয়োকার কিছু বক্তব্যে সন্দেহের ছায়াপাত

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর গ্রাহকদের প্রতি

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা। বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। পত্রিকা ডাকে পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। তবে সেক্ষেত্রে ডাক মাশুল সহ গ্রাহক চাঁদা পনেরো টাকা। "বিজ্ঞানকর্মী"—এই নামে ব্যাঙ্ক-ড্রাফ্‌ট বা মানিঅর্ডার করে টাকা পাঠাতে পারেন। নিচে ঠিকানা দেওয়া হল।

প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী ☐ B2 বৈশাখী ☐ 153/1 যশোহর রোড, কলিকাতা 700074

প্রকাশিত হ'ল

বিজ্ঞানশিক্ষা : প্রাথমিক হালচাল

প্রকাশক : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা

প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী
B2 বৈশাখী, 153/1 যশোহর রোড, কলিকাতা 700074

এ রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞানশিক্ষার একটি বিশদ পর্যালোচনা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী যেখানে পাবেন

☐ বাসন্তী বুক স্টল—শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় (ঘোষ কেবিনের পাশে)
☐ পাল বুক স্টল—শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় (হরিদাস মোদকের মিষ্টির দোকানের পাশে)
☐ দত্ত বুক স্টল—বাগবাজার (দ্বারিক ঘোষের পাশে)
☐ পাতিরাম—কলেজ স্ট্রীট
☐ মহীন্দর বুক স্টল ; কে সিং ; নন্দীকিশোর (নান্‌কা) ; শম্ভু মণ্ডল ; মহেন্দ্র মণ্ডল—কলেজ স্ট্রীট (পাতিরামের সামনে ফুটপাতের স্টলগুলোতে)
☐ মা কালী বুক স্টল—শ্রীমানি মার্কেটের বিপরীতে বিধান সরণীতে
☐ ঘোষ বুক স্টল—বিধান সরণী (বিদ্যাসাগর কলেজের কাছে)
☐ রাণা'র দোকান—কলেজ স্কোয়ারের উল্টো দিকে
☐ দমদম স্টেশন ; শিয়ালদহ স্টেশনের স্বপন, পঙ্কজ ও চঞ্চলের বুক স্টল
☐ অয়নায়ন—গড়িয়াহাট মোড়
☐ রায়গঞ্জ সাইন্স ক্লাব

বি-ও-বি'র কথা

বিজ্ঞান-গবেষণায় ব্যয় বরাদ্দ (1988-89)
প্রত্যাশা বনাম প্রবণতা

বিশ্ববিদ্যালয় বা আই. আই. টি.-র বাৎসরিক সমাবর্তন ভাষণগুলোতে, অনেক সময়ই, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের খুব ঘরের লোকজনের মুখেও আমরা দেশীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনীতির প্রবল সমালোচনা শুনে থাকি, শুনি তার খোল-নলচে বদলে ঢেলে-সাজানোর প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তার কথা। ব্যাস্—ওই পর্যন্তই! সে সব সময়ে এখনও একটা ক্ষীণ আশাবাদ জাগে—মনে হয়, হয়তো নতুন কিছু ঘটতে চলেছে—যেমন নতুন ভাবনা-চিন্তা, অগ্রাধিকার প্রশ্নের পুনর্বিন্যাস, বিজ্ঞান-বাজেটের বিস্তৃত হেরফের এবং তার মূল অভিমুখ পরিবর্তন, ইত্যাদি। কিন্তু কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা—অবস্থা যে-কে-সেই। এ বছরের বিজ্ঞান গবেষণায় ব্যয়-বরাদ্দের দিকে একবার চোখ পড়লেই প্রত্যাশা ও প্রবণতার এ দ্বন্দ্বটি স্পষ্ট হ'য়ে যাবে। হঠাৎ প্রত্যাশা কেন? কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রীর প্রযুক্তি-উপদেষ্টা সত্যেন স্যাম পিত্রোদার কণ্ঠে আমরা দেশীয় প্রযুক্তি-নীতির প্রায় মারমুখী (!) মূল্যবান সমালোচনা শুনেছি। তারপর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন (1988)-এ শুনেছি INSA প্রেসিডেন্ট ডঃ পেইণ্টাল-এর গলায় প্রায় একই ভাবের ভাষান্তর এবং অনুরূপ তীব্রতায়ই তা প্রকাশিত, যার সারাৎসার এখানে দেওয়া হ'ল: "India has few institutions which can carry out research and development work in areas that should be receiving top priority…For example, nobody has thought of finding ways to reduce the temperature of workplaces to 28°C which alone would improve efficiency. No technologies have been developed to tap India's huge hydroelectric resources and applied work pertinent to national problem has been neglected." ['NATURE' 332, no. 6162, p 296 (24 March 1988)]। এ সবই খুব ভালো কথা। কিন্তু ব্যথাটি অন্যত্র!

এবারে আমরা ব্যয়-বরাদ্দের তালিকাটি পেশ করছি। তার আগে দু'একটি কথা বলে নিই। বিজ্ঞান গবেষণায় ব্যয় বরাদ্দ বেড়েছে—এটা ভাল খবর। তবে এক্ষেত্রেও মুদ্রাস্ফীতির কথাটা মাথায় রেখে সংখ্যা-স্ফীতিটিকে হিসেব করতে হবে। বিজ্ঞান গবেষণায় মোট ব্যয় হবে (1988-'89 সালের আর্থিক বছরে) প্রায় মোট 17000 মিলিয়ন টাকা—যার শতকরা প্রায় 70% ব্যয় হবে অ্যাটমিক এনার্জি ও স্পেস গবেষণায়। সেই তুলনায় প্রতিরক্ষা বাজেটে আপাতদৃষ্টে ব্যয় হবে কম—'মাত্র' 6400 মিলিয়ন টাকা।

ব্যয়-বরাদ্দের বিস্তৃত বণ্টন চেহারাটি নিম্নরূপ [সূত্র—'NATURE' 332, no. 6160 p 103 (10 March 1988)] :

	টাকা (মিলিয়ন)
অ্যাটমিক এনার্জি	8490
স্পেস	3540
এগ্রিকালচারাল রিসার্চ	960
ইলেকট্রনিক্স্	1400
ওস্যানোগ্রাফিকাল গবেষণা	220
বায়োটেকনোলজি	450
শিল্পখাতে গবেষণা	880
মেডিক্যাল গবেষণা	200
অন্যান্য "	930
(কাছাকাছি)	17,000

অ্যাটমিক এনার্জি এবং স্পেস রিসার্চের একটি বড় (বরং বৃহত্তম) অংশই যে ঘোরাপথে কার্যত প্রতিরক্ষা-গবেষণা সেটা প্রায় সবাই জানেন এখন। তবুও শাক দিয়ে মাছ ঢাকার করুণ চেষ্টা! তা হোক। দেশের প্রতিরক্ষার প্রশ্নটি নিশ্চয়ই হেলাফেলার নয়। আবার সবও নয়! বাজেটের বর্তমান বিন্যাস থেকে একথাটি স্পষ্ট যে ডঃ পেইণ্টাল কথিত হাইড্রোইলেক্ট্রিক শক্তির সম্ভাবনাকে সদ্ব্যবহার করা বা কাজে লাগানোর বিশেষ সুযোগ তাহলে থাকছে না কিন্তু এ বছরেও। পরবর্তী লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হ'ল কৃষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষে কৃষি-গবেষণায় ব্যয়ের কৃশ অঙ্কটি—বিশেষ করে গত বছরের প্রচণ্ড খরার পটভূমিতে। এবং এটা নিয়ে প্রায় কোনো মত পার্থক্য নেই যে "Indian budgets are a gamble on the monsoons"। এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ হয়তো স্পেস রিসার্চের প্রয়োজনীয়তার কথা বলবেন। কিন্তু একটি কথা মনে রাখা ভালো যে সঠিকভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস-মাত্র জানা আর খরা-বন্যা মোকাবিলায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, এ দুয়ের ভেতর ব্যবধান কিন্তু প্রায় আকাশ-পাতাল। আর, দেশীয় প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক হিসেব-নিকেশ বা বনজ সম্পদের অবস্থান-জরিপ? এ ব্যাপারে খুবই ঠিক কথা বলেছেন শ্রী অমলেন্দু দাশগুপ্ত মশাই—যিনি ছিলেন The Statesman পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক এবং যিনি নিজে বিজ্ঞাননীতি বিশেষজ্ঞও একজন। বলেছেন—"There are far less expensive methods of improving weather forecasting and exploring natural resources, and other areas in which new technologies can be

developed or old ones better applied for more immediate and substantial econonic and social gains." (The Statesman, Calcutta edition, 28 July 1988, p 6)। আর বিকল্প শক্তির সন্ধানে অ্যাটমিক এনার্জির ভূমিকা শুধু ভারতবর্ষ কেন, বিশ্ব-পরিস্থিতিতেই, এখন প্রায় অবান্তর হয়ে পড়েছে। মূলত, অস্ত্র-গবেষণার জন্যই এখনও তার রবরবা।

বিদেশী সহযোগিতায় পরিচালিত সেই স্পেস গবেষণাটিও যদি সাফল্য লাভ করতো তবু না-হয় একটা সান্ত্বনার উপাদান পাওয়া যেত। গত 24 March 1987-তে এবং 13 জুলাই 1988-তে দুটি ASLV II উৎক্ষেপণের কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই শূন্যে গুঁড়িয়ে যায় এবং বঙ্গোপসাগরের জলে লুটিয়ে পড়ে। একটি ASLV উৎক্ষেপণে ব্যয় হয় প্রায় 20 কোটি টাকা—যার অর্থ গত 1 বছর 4 মাস সময়ে ভারতীয় জনগণের প্রায় 40 কোটি টাকা অকারণে নষ্ট হ'ল স্পেস গবেষণায়, এ রকম ক্ষেত্রে চীনে অসাফল্যের হার মাত্র 20% আর ভারতবর্ষে এখন পর্যন্ত 65%। অন্যান্য উন্নত দেশের সংগে তুলনা আর না করাই ভালো—চিত্রটি আরো লজ্জাকর হ'য়ে দাঁড়াবে!

সবশেষে প্রশ্ন তাই—স্যাম পিত্রোদাজী বা প্রফেসর পেইণ্টাল যা বলেছেন বা বলছেন, এ সবই কি শুধু কথার কথা, সমালোচনার জন্যই সমালোচনা ও শূন্য আস্ফালন; এবং এর কোনোটাই কি কার্যকরভাবে কিছু সংশোধনের জন্য নয়? নাকি বিজ্ঞাননীতি-প্রণয়ণে ও রূপায়ণে এঁদের কোনো আসল ভূমিকা নেই—এঁরা নিছকই কি কেবল লোক-দেখানো অলঙ্কার? প্রধানমন্ত্রীর হাতেই এখন দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর; আগেও তাই ছিল—সেটা হঠাৎ একদিন সম্পূর্ণ জনমুখী হ'য়ে উঠবে এ-রকম ভাবনাই হয়তো আসলে আমাদের মনের ভুল, চিন্তা-বিলাস বা দিবাস্বপ্ন। □

সুব্রত ভট্টাচার্য

ভূপালের রিজিওনাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী কি বন্ধ হচ্ছে?

ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যে একটি ক'রে জাতীয় গবেষণাগার (National Laboratory) অথবা Regional Research Laboratory আছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী 1983 সালে মধ্যপ্রদেশের ভূপালে একটি RRL স্থাপিত হয়। কিন্তু 1986 সালে আবিদ হাসান কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করে—"এটি আশানুরূপ মানে পৌছতে পারে নি। এজন্য এটিকে রাজ্য সরকারের অধীনে আনা হোক; সেক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সাহায্য দেবে। সে সময়ের মধ্যে যথেষ্ট উন্নতি না দেখা গেলে গবেষণাগারটিকে যেন বন্ধ করে দেয়া হয়।"

এদিকে 1986 সালের পর থেকে এই গবেষণাগারে লক্ষ্যণীয় উন্নতি দেখা গেছে এবং রাজ্যের বিজ্ঞানকর্মীরা এর প্রয়োজনীয় ভূমিকা অনুভব করছেন। তা সত্ত্বেও মধ্যপ্রদেশের এই একটিমাত্র জাতীয় গবেষণাগারকে যদি বন্ধ করা হয় তবে রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি যথেষ্ট ব্যাহত হবে একথা বলা যায়।

সম্প্রতি ভারত হেভি ইলেকট্রিকালসের (BHEL) ভূপাল ইউনিটের কাছে প্রস্তাব রাখা হয়েছিলো এটিকে অধিগ্রহণ করার জন্য। কিন্তু গবেষণাগারটির কর্মধারার সঙ্গে BHEL-এর কাজকর্মের সঙ্গতি না থাকায় এবং এই আধা-সরকারী সংস্থাটির একটি নিজস্ব গবেষণাগার থাকায় অধিগ্রহণের সম্ভাবনা কম।

RRLটির উন্নতি না হওয়ার জন্য CSIR-কেই অনেকাংশে দায়ী করা চলে, কারণ—প্রথমত 1983 সালে খোলা হলেও গবেষণার কাজ এখানে শুরু হয় বহু পরে। দ্বিতীয়ত প্রথম ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে বিদেশে পাঠানো হয়েছিলো বেশ কয়েক বছরের জন্য, ফলে গবেষণাগারটি অভিভাবকহীন অবস্থায় ছিলো। রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলিও এটিকে রক্ষার ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ত্রিবান্দ্রামের RRLটিও বন্ধ করার প্রস্তাব ছিলো, কিন্তু কেরলের বিরোধী ও শাসকদলের মিলিত প্রচেষ্টায় সেই প্রস্তাব কার্যকর হতে পারে নি।

"The Government has too many programmes and as many priorities and would like to build more institutions than maintain the existing ones properly."—এই মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য প্রযুক্তি উপদেষ্টা 'স্যাম' পিত্রোদার।

প্রতিবেদক : সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

[সূত্র : Madhyapradesh Chronicle, 8.6.88]

□□ বাড়াবাড়ি—দুনিয়া জুড়ে □

আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-শিল্প-পরিবেশধ্বংস নিয়ে যে মৌলিক সমালোচনাগুলি করা হচ্ছে তার সবটাই কি শুধু একদল নিন্দুকের বাড়াবাড়ি? অথচ সমালোচনার একটা বড় অংশ কিন্তু উঠে আসছে 'উন্নত' এলাকার মানুষদেরই ভিতর থেকে। সাম্প্রতিক পর্যায়ের সমালোচনায় যুক্ত হয়েছে নতুন কিছু মাত্রা। তারই একটি প্রাথমিক পরিচিতি।

এই বি-ও-বি পত্রিকা ধরেই শুরু করা যাক। বি-ও-বি'র রিডার সার্কেল বড় নয়। এর মধ্যে কিছু আছেন যাঁরা বিজ্ঞানী এবং 'একাডেমিকস' মহল বলে পরিচিত। এনারা অনেক সময় বি-ও-বি সম্পর্কে ব্যঙ্গ করে বলেন—'সবেতেই এদের বাড়াবাড়ি'। 'এনভায়রনমেণ্ট-সায়েন্স-টেকনলজি—এসব নিয়ে কি যে এরা বলে!'—ইত্যাদি।

বি-ও-বি বাড়াবাড়ির অভিযোগে অভিযুক্ত!—অস্বীকার করি না। আমিও তাই বলি। ব্যক্তিগতভাবে বি-ও-বি'র সাথে যুক্ত থেকেও বলছি। কেন—বলতে গিয়ে Paul Baran এবং Paul Sweezy'র লেখা Monopoly Capital বইয়ের[1] ভূমিকা থেকে একটি উদ্ধৃতি দেব—

"One type of criticism we would like to answer in advance. We shall probably be accused of exaggerating. It is a charge to which we readily plead guilty. In a very real sense the function of science and art is to exaggerate, provided that what is exaggerated is truth but not falsehood."

বাড়াবাড়ি আমরা সচেতনভাবেই করি। আমরা একা নই। দুনিয়া জুড়ে এমন বাড়াবাড়ি অনেকেই করেন। এখনও করছেন। করছেন তোলপাড় বিতর্ক। এই 'পরিবেশ' নিয়েই। এবং তার সাথে শিল্প-কারখানা তথা বিজ্ঞান প্রযুক্তি নিয়ে। এর স্বরূপ ও ভূমিকা নিয়ে। ভাবনা হিসেবে এটা নতুন নয়। আগে ব্যাপক ছিল না। সম্প্রতি হয়েছে। একে উস্কে দিতে সাহায্য করেছে, গেল কয়েক দশকে উদ্ভূত নতুন কিছু সমস্যা। কিছু আন্দোলন। কিছু সমীক্ষা-পর্যবেক্ষণ-রিপোর্ট। কিছু গবেষণা-পত্র বই।

পরিবেশ তথা ইকলজি নিয়ে বিস্তর কথা হচ্ছে। মনোযোগী না হলে কোলাহল বলে ভুলও হতে পারে। আসলে নতুনভাবে এই বীক্ষণ সমাজ-ভাবনার ক্ষেত্রে একটা ভিন্ন প্রেক্ষিত এনে দিয়েছে।—মানুষ সমাজ তার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং প্রকৃতি নিয়ে একটা গোটা প্রেক্ষিত।—একটা 'connectedness'-এর ধারণা। Barry Commoner তার Closing Circle বইয়ে[2] সরল কথায় বলেছেন—Everything is connected to everything else—যা প্রকৃতি রাজ্যের অন্যতম মর্মবাণী।

এই connectedness বিঘ্নিত হচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নামে। ধ্বংস করা হচ্ছে প্রকৃতির ভারসাম্য। প্রধান আসামী—পুঁজিবাদী উৎপাদন তথা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।—এক বাক্যে রায় দিচ্ছেন প্রায় সকলে। যারা প্রায় সকলেই তথাকথিত উন্নত পুঁজিবাদী দেশেরই লোকজন।

বেশ চলছিল এ্যাদ্দিন। Economic Growth-এর ঢাকের বাদ্যি আর ঝক্‌ঝকে পণ্যের ঢালাও পস্‌রা দুনিয়া জুড়ে মানুষের চোখে নেশা ধরিয়ে দিচ্ছিল। যা সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চমকপ্রদ অগ্রগতির(!) ফলে। Growth-এর মোহে দক্ষিণের 'কালু-ভুলু'র দেশের কর্তারাও আঁকশি নিয়ে ঘুর ঘুর করছিল 'আমটি আমি খাব পেড়ে' বলে।

এমন সময় ঘটল ঘটনাটা। একদল লোক এক গুচ্ছ হিসেব নিয়ে হাজির হলেন। দেখালেন এইভাবে গুটিকয়েক দেশের কতিপয় মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের যোগান দিতে যে পরিমাণ বিষ ছড়িয়েছে বাতাসে, যে পরিমাণ রাসায়নিক মিশেছে মাটিতে জলে, যে পরিমাণ বনভূমি ধ্বংস হয়েছে, যে পরিমাণ মানুষ জমি-জীবিকা চ্যুত হয়েছে, যে পরিমাণ জ্বালানী নিঃশেষিত হয়েছে, যে পরিমাণ খনিজ সম্পদ অপচিত হয়েছে, যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়েছে বায়ুমণ্ডলে, যে পরিমাণ অর্থ ও ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে গুটিকয়েকের হাতে—তা এক কথায় অভূতপূর্ব এবং ভয়ঙ্কর। Club of Rome রচিত Limits to Growth বইয়ে[3] এই আশঙ্কা স্বীকৃত হয়েছে।

কিছু লোক তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন এই হিসেব। বলেছেন —Limits to Growth-এর লেখকদের কাঁধে ম্যালথাসের ভূত চেপেছে। বাড়াবাড়ি সব।

খোদ মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কার্টার কিন্তু উপেক্ষা করতে পারেন নি এই হিসেব। অবস্থা খতিয়ে দেখতে 'বিশ্বস্ত বিশেষজ্ঞ' লাগিয়েছিলেন। The Global 2000 Report to President—তার ফলশ্রুতি[4]। যা একই হুঁশিয়ারী দিয়েছে। হাওয়া বুঝে অনেকে Zero Growth Economy'র আওয়াজ তুলেছেন। মন দিয়েছেন নয়া মডেলে সমাজের রূপরেখা রচনায়। লক্ষ্য—Sustainable Society! Lester Brown লিখেছেন[5] Building a Sustainable Society; প্রশ্ন তাহলে—এখন যা চলছে তা sustainable নয়!

কেন নয়, কিভাবে এমনটা হল? খতিয়ে দেখছেন ওইসব দেশেরই

লোকজন। সেই ভাবনা চিন্তা প্রকাশিত হচ্ছে পত্র-পত্রিকায় বইয়ে। খুব বেশী নয়—গত তিন দশকে প্রকাশিত খান কতক বই থেকেই তার আন্দাজ মিলবে। পুঁজিবাদের backyard dustbin ঘেঁটে লেখা এ সব বই পড়লে বাড়াবাড়ি মনে হবে। তবে পড়া দরকার। আমাদের দেশও তো 'উন্নতিকামী'!

উন্নয়নের নামে প্রকৃতির ওপর লাগাতার হামলা কিভাবে পৃথিবী নামক ছোট্ট গ্রহটির অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ—Rene Dubos এবং Barbara Ward রচিত Only One Earth বইটি[6]। এই হামলা নিজেদের দেশেই সীমাবদ্ধ নেই। বিস্তৃত দক্ষিণের দরিদ্র দেশের ভূখণ্ডেও—দেখিয়েছেন Erick Eckholm তাঁর Down to Earth বইয়ে[7]। প্রকৃতির রাজ্যে 'connectedness'-এর নমুনা Ratchel Carson লিখিত Silent Spring বইটি[8]। দেখিয়েছেন কীটনাশক বিষ কিভাবে ক্ষেত থেকে খাবারের পাতে পরিবেশিত হচ্ছে।—এই বিষ কিভাবে হাজার হাজার মাইল সমুদ্র পেরিয়ে নির্জন দ্বীপবাসী পেঙ্গুইনদের দেহে স্থান করে নিচ্ছে। নিউক্লিয়ার কর্মকাণ্ডের নামে মানুষ মরণ খেলায় মেতেছে। পাগলামির বিবরণ জানতে Jonathan Schell-এর The Fate of the Earth বইটি[9] পড়া যেতে পারে। পৃথিবীর অর্ধেকের মত মানুষের পেট ভরে খাওয়াই জোটে না। সেখানে খাদ্য নিয়ে কি জঘন্য খেলা চলতে পারে—এবং গুটিকয়েক দেশের মানুষের জন্য পুষ্টিকর প্রোটিন যোগাতে দরিদ্র মহাদেশের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড কিভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে তার ইতিবৃত্ত লেখা হয়েছে দু'টি বইয়ে। Francis Moor Lappe ও Joseph Collins-এর Food First এবং Susan George-এর How the Other Half Dies বই দুটিতে[10]। এমন আরো বই আছে। সব নাম দিচ্ছি না। কেবল একটি ছাড়া। সেটা হল—Economics and the Crisis of Ecology[11]। লিখেছেন—Narendra Singh। প্রচণ্ড ঝাঁঝের সাথে লেখা। তুলো ধোনা করেছেন পরিবেশ ধ্বংসকারী পুঁজিবাদী শিল্প অর্থনীতিকে। হয়তো আবেগ জড়িয়ে গেছে একটু বেশীই। বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে।—তবে ধোলাই দিতে হয় তো—এইস্যাই হোনা।

শোষণ আছেই। মানুষের উপর মানুষের শোষণ। এ নিয়ে ভাবনা কম হচ্ছে না। কিন্তু মানুষের চারপাশের প্রকৃতিকে এক সাথে যুথে নিয়ে ভাবনাটা নতুন। সমাজভাবনার ক্ষেত্রে এ এক নতুন উপলব্ধি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক ব্যাখ্যায় নতুন মাত্রা। যা গৌণ বলে প্রায় উপেক্ষিত ছিল মার্কসীয় বিশ্লেষণে। ধরে নেওয়া হয়েছিল উৎপাদনী শক্তির অবাধ বিকাশে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই—কেবল উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্ব-বিরোধ ব্যতিরেকে। প্রকৃতির ভাণ্ডারের যোগান নিয়ে সংশয় ছিল না। —সংশয় ছিল না মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের গতি-প্রকৃতি চরিত্র নিয়ে। —"Natural resources were never at the centre of the stage in Marxist thinking. Also, the environment was rarely looked upon as a distributive issue. It was a 'given' in the development situation of most countries". —বলেছেন, Michael Redclift তাঁর Development and the Environmental Crisis বইতে[12]। এবং এই বইতেই লিখেছেন, বিশ্বাস করা হয়েছিল—"No contradiction existed between man's mastery of nature and his ability to exploit **science** for his own ends. From an historical materialist perspective it was **society**, not **science** which placed restriction on human potential".

অনুরূপ প্রসঙ্গে Francis Sandbach তাঁর Environment, Ideology and Policy বইতে[13] বলেছেন—"The question of resource scarcity and pollution control are linked to the organisation of Capital, the modes of production and the power base within society". তবে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার শক্তি কাঠামোতেও এই সমস্যা অশ্রুত এমন নয়। দৃষ্টান্ত—সোভিয়েত রাশিয়া। ক্ষমতা কাঠামোয় হাত বদল হলেও শিল্প কাঠামোয় খুব বদল হয়েছে এমন নয়। তথ্যের জন্য D. R. Kelley-র The Economic Superpowers and the Environment বইটি[14] দেখা যেতে পারে। এবং আরো বিশদ জানতে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে গোপনে পাচার হওয়া পাণ্ডুলিপি—The Destruction of Nature in Soviet Union, দেখা যেতে পারে[15]। —লেখক B. Komarov।

আসলে আজকের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা যতখানি বলে সাধারণের বিশ্বাস—প্রকৃতপক্ষে এর ব্যাপ্তি তার চেয়েও বেশী। আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরী কৃৎকৌশল দু'ধারি ছুরির মত। একদিকে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে এক অভাবনীয় পর্যায়ের শক্তি সংহত করতে সাহায্য করেছে। অন্যদিকে জনমানসে গড়ে তুলেছে একটা 'myth'। ওপর নীচের বিরোধ যত মৌলিকই হোক—অন্তত এই জায়গায় এসে দু' তরফের চেতনা প্রায় হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছে। —বিজ্ঞান ও যন্ত্রের উপর বিশ্বাস ও নির্ভরতার প্রশ্নে। যাতে রাষ্ট্রশক্তির আখেরে লাভ বেশী। ফলে শক্তিধরের সাথে লড়াইয়ে মুঠি যত জোরেই ছোঁড়া হোক—প্রায় একই বেগে হড়্‌কে যাচ্ছে পায়ের তলার মাটি।

বিজ্ঞান ও কারিগরী কৃৎকৌশল সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি—এই প্রতীতি আজ প্রায় সার্বজনীন। এবং এর ঠিকেদারী কিছু লোকের হাতে ন্যস্ত করে পরম নিশ্চিন্ত আছে মানুষ। এই 'সর্ব রোগ হর' কৌশল জন্মলগ্ন থেকে বিগত কয়েক শতক ধরে পুষ্টিলাভ করে আসছে সেই ঠিকেদারদের হাতে—বিশেষ একটি ideology'র ছত্রছায়ায়। ফলে এর সারা অঙ্গে লেপ্টে আছে পুঁজিবাদী আদর্শের আদল। এখন এর কোলে যে সন্তানই তুলে দাও সে এরই ছাঁদে গড়ে উঠতে বাধ্য।—উঠছেও। অথচ এর প্রতি আস্থায় কোন ব্যত্যয় নেই।—এবং তা নিঃশর্ত। প্রত্যাশা—ক্ষমতার হাত বদল হলে আসবে বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিক বদল। হয়ত এ স্বপ্ন সার্থক হত যদি মানুষের মতিগতি চক্রাকার পথের অর্ধ পথে এসে থেমে থাকত।

'ক্ষমতা'র চূড়োয় বসেও চেতনা আটকে থাকত এক জায়গায়। এবং এ পর্যন্ত অধীত 'বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞান' সর্বতোভাবে উৎপাদনের 'neutral' হাতিয়ার মাত্রই হত!

কিন্তু তাই কি হয়?—না, হচ্ছে? Langdon Winner, David Dickson প্রমুখের[16] প্রযুক্তি বিকাশের ধারা অন্বেষণের পথ ধরে ফল-শ্রুতিতে এই সংশয় ক্রমে বদ্ধমূল হচ্ছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি একদিন বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত শ্রমশক্তিকে খোলা আকাশের নীচে ক্ষেত খামার থেকে কারখানার ছাউনির নীচে এনে জড়ো করেছিল। দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল সারবদ্ধ যন্ত্রের সামনে—হাতে দিয়ে নতুন হাতিয়ার। ফলে তার চেতনার খাত গিয়েছিল বদলে। আজকের প্রযুক্তি আরেকবার পরিবর্তন আনতে চলেছে সেই শ্রমক্ষেত্রে। সাবধান বাণী উচ্চারণ করে Barry Jones লিখেছেন[17]—Sleepers, wake! দরকার নেই মানুষের কর্মকুশলতা। সে আজ বিতাড়িত হতে চলেছে কারখানা চত্বর থেকে। সেই বিজ্ঞান প্রযুক্তির হাত ধরেই। এই নিয়ে Farewell to Working Class বই[18]। লিখেছেন Andre' Gorz। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ছে Alvin Toeffler-এর Future Shock-এর কথা[19]। সেই ফিউচার কি খুব দূরে?

একদিকে পরিবেশ অন্যদিকে জনজীবন ও মানসে ওলট-পালট করে চলেছে যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-যন্ত্রসভ্যতা তার সম্পর্কে সমালোচনায় অস্পষ্টতা ক্রমে কমে আসছে! Fritjof Capra তাঁর Turning Point বইয়ের[20] এক জায়গায় লিখছেন—"It is now becoming apparent that over-emphasis on the scientific method and on rational-analytical thinking has led to attitudes that are profoundly anti-ecological". অতিশয়োক্তি মনে হচ্ছে? মনে হলে—মত পরিবর্তনের চেষ্টা করুন। কারণ Roger Bacon-এর দেশের লোককেও বদলাতে হয়েছে মতটা। বিজ্ঞানের ধ্বজাধারী সেই দেশের লোককে এত পথ পরিক্রমার শেষে ফের নতুন করে তৈরী করতে হয়েছে—Blueprint for Survival। 1972 সালে The Ecologist পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে প্রচারিত হয় সুস্থ ভাবে বাঁচার এই 'ব্লুপ্রিণ্ট'। এর সমর্থকের সংখ্যা বাড়ছে। বিলেতে—এবং অন্য দেশেও।

আগেই বলেছি—এমন আশঙ্কা এবং ভাবনা নতুন নয়। অনেক আগেই অনেকে বলেছিলেন। সকলের উদ্দেশ্য এক ছিল না হয়ত। তবু এঁরা নিন্দিত ছিলেন—অথবা উপেক্ষিত। কিন্তু আবার নতুন করে এঁদের মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম—Robert Owen, Charles Fourier, Mikhail Bakunin, Prince Peter Kropotkin, William Morris, John Ruskin। এঁদের অন্যতম উত্তরসূরী সাম্প্রতিক কালের একটি নাম—Lewis Mumford। তিনি তাঁর Pentagon of Power বইয়ের[21] এক জায়গায় বলছেন—"The greatest revolution needed to save mankind from the projected assault against life by the controller of megamachines demands first of all the displacement of the mechanical world picture with an organic world picture, in the centre of which stands man himself in person…"।

আমেরিকায় ইওরোপে অনেক মানুষ দেখছি নতুনভাবে সংঘবদ্ধ হচ্ছেন—অনেকটা এই লক্ষ্যে। "—To give face to faceless, a voice to the voiceless—and to each person the one face, the one voice, that is uniquely theirs..."—বলেছেন Theodore Roszak তাঁর Person / Planet বইয়ে[22]। যদিও তাঁর অনুমান—"Politics of person has yet to be invented"—তবু এঁরা সংঘবদ্ধ হচ্ছেন। সক্রিয় হচ্ছেন। প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছেন। বিভিন্ন ইস্যুতে। ছোট ছোট গ্রুপে। নানান নামে। যাদের নামের আদলে নেই রাজনৈতিক দলের সাবেকী ছাঁদ। এরা—Green Peace, Ground Zero, CND, OOA, Women for Life on Earth, Pesticide Network, Beyond the Fragments groups, Food First group, Ecology Party, Green Party, Friends of the Earth (সংক্ষেপে FOE (!)), ইত্যাদি। এঁদের অনেকেরই দাবী তাদের পলিটিকস্ হল—Politics of Life। কথাটি নেওয়া সম্ভবত Small is Beautiful-এর[23] লেখক Fritz Schumacher-এর কাছ থেকে।

মতাদর্শের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থানের মানুষ এঁরা। ফলে সমস্যার উৎস নিরূপণে, সমাধানের প্রশ্নে, কাজের পদ্ধতিতে—বিস্তর ফারাক এঁদের মধ্যে। অনেকে আছেন, প্রকৃতিকে দেখেন পবিত্রতার চোখে। তাই নীতিগত কারণেই প্রকৃতির উপর হস্তক্ষেপের বিরোধী। অনেকে আছেন—আরেকটু রয়ে সয়ে হস্তক্ষেপে বিশ্বাসী। অনেকে আছেন—যেমন চলছে তাতে আপত্তি করবেন না যদি conservation-এর ব্যবস্থাটি পাকা হয়। অনেকে মনে করেন আসলে গণ্ডগোলটা, যথার্থ scientific analysis-এর ভিত্তিতে কাজ হচ্ছে না বলেই। অতএব গোটা ব্যাপারটা Computer Modellers and Systems Analyst-দের হাতে ছেড়ে দিলেই আর সমস্যা থাকে না। অনেকে আছেন যারা বিরোধটা নিছক 'growth' আর 'consumption'-এর মনে করেন না। মনে করেন—"conflict about what to use,what to produce and how to pay for it"-এর। Hugh Stretton তাঁর Capitalism, Socialism and Environment বইতে[24] এমনটা বলেছেন। পশ্চিম জার্মানীর গ্রীন পার্টির অন্যতম সংগঠক Rudolf Bahro'র মতে—"Under the Capitalism pattern we have assumed that man needs everything that capitalism offers him, needs more and ever more. The fact that the earth's resources are limited like the earth itself, compels us to ask what man really needs for his development as a human

being"—দেখুন বাড়াবাড়ির পথ বেয়ে মানুষ আজ প্রশ্নটিকে কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে। এবং এরা কারা? সেই বাড়াবাড়ির দেশেরই মানুষ। যারা ভোগ্য পণ্যের ব্যাপারে কি চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি-ই না করে চলেছে।—এ কি ভোগে নিছক অনীহা? Bahro কথাগুলো বলেছেন New Left Review-র সাথে এক সাক্ষাৎকারে। সাক্ষাৎকারের বিবরণ বই[25] হিসেবে প্রকাশিত। নাম—Red to Green। প্রায় একই ইঙ্গিত দিয়েছেন Erich Fromm তাঁর To Have or To Be বইতে[26]। একই কথা বলতে শুনি বৃটেনের FOE-র একজন—Richard Sandbrook-কে—"we must regulate the market place. And so the idol of market is dead…"।

কথাগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে বলা হলেও—একটু ভাবলেই বোঝা যায় প্রশ্নগুলি Political Economy'র সাবেকী ধারণায় সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি-আকর্ষণী ইঙ্গিতও বটে। বিশেষ করে সেই অর্থনীতিবিদদের উদ্দেশ্যে যাঁরা cost of externalities-এর হিসেব কষে পরিবেশ তথা আনুষঙ্গিক বিতর্কের দায় মেটাতে চাইছেন।

উপরে বর্ণিত গ্রুপ ও কাজের ধারাকে Francis Sandbach নাম দিয়েছেন Ecological / Scientific Environmentalism। আরেকটি ধারা আছে। যাকে বলেছেন—Anti-establishment Environmentalism। যাদের বিশ্লেষণে—মূল বিষয় হল সমাজ ও প্রকৃতি থেকে মানুষের বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নটি। এরা Jurgen Habermas, Herbert Merucse প্রমুখের ভাবনার অনুসারী। এদের মধ্যে আছে ইওরোপের New Left অংশ। আছে Anarchist ভাবধারায় শক্তিশালী গ্রুপগুলো।

পরিবেশ আন্দোলনের একটি অংশ Feminist ধারার। যারা প্রকৃতি তথা ইকলজির সাথে তাদের 'বিশেষ সম্পর্কের' প্রশ্ন তুলে পরিবেশ বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। এদের কথায়— "As the essential impulse of the feminine principle is the striving towards balance and inter-relationship, it follows that feminism and ecology are inextricably inter-connected"। এঁরা মনে করেন পুরুষ-কর্তৃত্ববাদী ভাবধারার মধ্যে লুকিয়ে আছে ইকলজি বিরোধী মানসিকতার বীজ। এবং হাল আমলের scientific revolution-এর ভাবধারা 'ecological way of thinking' থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। Carolyn Merchant তাঁর The Death of Nature বইতে[27] এমনটাই বলতে চেয়েছেন।

এসব দেখে শুনে কি মনে হয়—সবই বাড়াবাড়ি? আসলে 'বাড়াবাড়ি' বোধটাই একটু গোলমেলে। সবার মধ্যেই একটা মাপকাঠি আছে—যেটা অভিন্ন নয়।—হতেও পারে না। —বিশেষ করে তাদের, যাদের 'এটায় কিংবা ওটায়' কিছুই এসে যায় না। তাই বিতর্কটা যখন এই পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে বালিয়াপাল মিসাইল প্রকল্পটা বাড়াবাড়ি, না কি প্রকল্প-বিরোধী লড়াইটা বাড়াবাড়ি—তখন সমর্থনটা যে কোন দিকেই ঝুঁকতে পারে। তবে বিশেষজ্ঞদের সমর্থন স্বাভাবিকভাবেই প্রবলতর পক্ষের দিকেই যাবে। —এবং যায়।

বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদ-বিশেষজ্ঞদের দায়িত্ব বড্ড বেশী। তাঁদের একবার কলমে কালি ভরে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ধ্বংসকারী নর্মদা বাঁধ প্রকল্প O. K. করতে হয়—আবার সেই কালিতেই বিশ্বপরিবেশ দিবসের জন্য দ্রুত-অবলুপ্তির-পথে বনভূমির পরিসংখ্যান update করতে হয়!

অবশ্যি তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ এটাই তো প্রফেশনালিজম্। সেখানে 'bias'-এর কোন স্থান নেই। —নেই 'বাড়াবাড়ি'র! বিজ্ঞান-প্রযুক্তি তথা বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদ্-একাডেমিকস্ এর উর্দ্ধে! —এবং neutral!! □

রবীন চক্রবর্তী

গ্রন্থপঞ্জী

1. Paul Baran and M. Sweezy—Monopoly Capital, M. R. Press, N. Y., 1968. 2. Barry Commoner—The Closing Circle, Alfred A. Knopf, N. Y., 1971. 3. D. C. Meadows et al—The Limits to Growth, Pan Book, London, 1972. 4. The Global 2000 Report to the President, Penguin, Harmondsworth, 1981. 5. Lester R. Brown—Building a Sustainable Society, Norton, N. Y., 1981. 6. Rene Dubos and Barbara Ward—Only One Earth, Penguin, 1972. 7. Erik Eckholm—Down to Earth, Pluto Press, London, 1982. 8. Ratchel Carson—Silent Spring, Hamilton, London, 1962. 9. Jonathan Schell—The Fate of the Earth, A. A. Knopf, N. Y., 1982. 10. Frances Moor Lappe and Josheph Collins—Food First, Souvenir Press, London, 1980; Susan George—How the Other Half Dies, Penguin, 1985. 11. Narendra Singh—Economics and Crisis of Ecology, Oxford

[গ্রন্থপঞ্জীর বাকি অংশ দেখুন তেরোর পাতায়]

॥ জনবিজ্ঞান : একটি নতুন জীবনচর্চা ॥

প্রদীপ দত্ত

জনবিজ্ঞান নিয়ে যেসব ভাবনাচিন্তা বা কাজ-কর্ম চলছে তা কতটা সফল হচ্ছে বিকৃত 'উন্নয়ন'-এর গতিমুখ বদলাতে? এর জন্য প্রয়োজন এক নতুন জীবন চর্চা। আমরা কি প্রস্তুত তার জন্য?

আমরা এগিয়ে চলেছি। মাইক্রোওয়েভ, স্যাটেলাইট দূরকে করছে মুহূর্তে নিকট। যোগাযোগ ব্যবস্থা ছোট গ্রামকেও সুযোগ দিচ্ছে তার সেরা জিনিস 'এক্সপোর্ট' করতে। পাল্লা দিয়ে বিস্তার ঘটছে প্রচারের—অতি দ্রুত হারে। টি ভি, ভিডিও, ফিচার, পত্র-পত্রিকার নিত্য নতুন চমক জাগানো উপস্থাপনের সৌজন্যে প্রসারিত বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাধারা এতাবৎকালের জীবনযাত্রার ব্যাকডেটেড মানসিকতায় ক্রমাগত সঞ্চারিত করছে আধুনিক নগর জীবনের এলোপাথারি সচলতা।

এই পশ্চিমবঙ্গে আমরাও সঙ্গী। দেখছি উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিযোগ-সম্ভাবনা সহজলভ্য প্রধানত কলকাতার চারপাশে, যেখানে বাস করে পশ্চিমবঙ্গের মোট নগরবাসীর কমবেশী 70%। কাগজপত্র অনুযায়ী যদিও রাজ্যের মোট জনবলের প্রায় 80% নগরবাসী, তবুও পুরুলিয়া বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমদিনাজপুর, মালদহ, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের চেয়ে নগরবাসী বৃদ্ধি হার কম—কর্মসূত্রে আসা সরকারী বেসরকারী সমস্ত কর্মীদের ধরেই এই অবস্থা। বাস্তবিক, নগরবিকাশ ওখানে অনেক অনেক পেছিয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর। এই তথ্যের আলোকে ফুটে উঠছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ ও মুখোশ। আর এই অসম বিকাশের মধ্য দিয়েই জাঁকজমকপূর্ণ রূপান্তরের পথে উন্নতির চমকে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে নগরায়ন। ওদিকে গ্রামবাংলায় অপারেশন বর্গাও পারে নি স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে। কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমশক্তি ক্রমশই কমছে। জমিতে চাষ করার চেয়ে মানুষ অপেক্ষাকৃত অনুৎপাদক বা সামাজিক বিচারে কম প্রয়োজনীয় কাজের মাধ্যমে আয় করার দিকে ঝুঁকছে।

শহর আর নগরগুলো ছেয়ে যাচ্ছে বহুতল পাকাবাড়ী আর আপ-টু-ডেট ভোগ্যপণ্যে। অন্যদিকে চাষবাসের উপর নির্ভরশীল প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে ওষুধ থেকে শুরু করে কোনো কিছুরই যোগান থাকে না, কেন না কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠিগুলির ক্রয়ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে ক্রমশই কমে আসছে। তাদের কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় সার, বীজ, যন্ত্রপাতির চাহিদাও আপেক্ষিক বিচারে ক্রমহ্রাসমান।

এটাই সর্বভারতীয় চিত্র। কী প্রাইভেট কী পাবলিক সেক্টর আজ আর নতুন ক্রেতা সৃষ্টি করতে পারছে না। বাস্তবিক কারুর পক্ষেই mass-consumption তথা আপামর মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্ত্র প্রভৃতির জন্য উৎপাদনের পথে থেকে লাভ সুস্থির রাখা সম্ভব হয়ে উঠছে না। 80 কোটি মানুষের দেশ, এদের মধ্যে 20 কোটি স্বচ্ছল ক্রেতা যাদের উপর ভরসা করে টিঁকে আছে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজার, পণ্য-উৎপাদন এবং লাভ বজায় রাখা। যেহেতু দেশীয় বাজার নেই তাই শিল্পজাত পণ্য-উৎপাদনে খরচ কমানোর জন্য বড় বড় শিল্প কারখানাগুলিতে আরও উন্নত যন্ত্রপাতি বসানো শুরু হয়ে গেছে। ফলে কর্মীসংখ্যা হ্রাস এবং বাজারে মোট ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস-এর প্রভাবে মার খেতে বসেছে এমনকি ছোট ছোট দোকানদার, বাজারের চাষীও। একদিকে এক তৃতীয়াংশ অনাহারে, অন্যদিকে বাজেটে গৃহস্থালীর জ্বালানী, পানীয় জল, শিক্ষা, বাসস্থান খাতে সংস্থান কমে বেড়ে চলেছে যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা এবং হাইটেক খাতে ব্যয়।

এদিকে, বিশ্বজোড়া ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শ্লোগানের আড়ালে, কম্পিউটার, স্যাটেলাইট, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদিকে অবলম্বন করে চলছে সমস্যাসঙ্কুল দেশগুলিতে নিত্য নতুন প্রযুক্তির বাজার খোঁজা। প্রযুক্তিবিদ, বিশেষজ্ঞ ও বিনিয়োগ পৌঁছে যাচ্ছে এইসব দেশে। গড়ে তুলছে নতুন প্রযুক্তির পক্ষে উপযুক্ত 'শিক্ষিত' সম্প্রদায়, যাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এইসব দেশের অনাবিষ্কৃত দ্বীপ থেকে শুরু করে শহরের বস্তিগুলিতে শুরু হয়ে গেছে নতুন ধরনের উৎপাদন ধারা—খরা বিধ্বস্ত পতিত জমিতে দ্রুতবৃদ্ধিশীল বাণিজ্যিক বনসৃজন, দ্বীপভূমিতে পশুপালন, সমুদ্রে মৎস্যশিকার, উর্ব্বর কৃষিজমিতে রপ্তানীযোগ্য কৃষিপণ্য উৎপাদন এবং এক্সপোর্টের স্বার্থে প্রয়োজনীয় প্রসেসিং করার জন্য ফার্ম গড়ে তোলা, যেখানে এগুলি রূপান্তরিত হয়ে পৌঁছে যাবে দূর দূরান্তের শহরে। মাইক্রো-ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ, ভোগ্যপণ্যের স্পেয়ার পার্টস থেকে শুরু করে প্যাকিং করার প্রয়োজনীয় কুটির শিল্প গড়ে উঠছে শহরের বস্তিতে নিম্নমজুরীতে নিয়োজিত মানুষদের নিয়ে। শ্রম বিভাজনের নতুন ধারায় নারী আর শিশুরাই প্রধানত অংশগ্রহণকারী—বেঁচে থাকার জন্য এদের এছাড়া অন্য পথ খোলা নেই। আর তাই ভয় নেই ট্রেড ইউনিয়নের ঝামেলার। কোথাও কোথাও প্রাইভেট ফার্ম নতুন scheme নিয়ে non-governmental organisation-এর সঙ্গে মিলে জাতীয় সেবামূলক কাজের অন্তরালে সরকারী আমলাতান্ত্রিকতা এবং বিভাগীয় নিয়ম-কানুন এড়িয়ে উপস্থাপিত হচ্ছে নব্য চিন্তাসমন্বিত সাংগঠনিক শক্তি হিসাবে। এই ভাবেই পরীক্ষা চলছে যুগোপযোগী বিকাশের স্বার্থে রাষ্ট্রের কব্জামুক্ত খোলা বাজারের। এবং এরই মধ্যে, উন্নয়নের স্বার্থে বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে শিল্পাঞ্চলে ও অর্থকরী ফসলের ক্ষেতে জল-বিদ্যুৎ কৃষিজ-বনজ-খনিজ সম্পদ priority basis-এ যোগান দেওয়া। আর আজ যা অবস্থা, শহরের পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য কোথাও কোথাও নদীর উচ্চ অববাহিকায় জঙ্গল ধ্বংস করে জলাধার গড়ে তোলার

পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। ফলত ক্রমাগত ক্ষয়িষ্ণু কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠি-গুলির মানুষের পক্ষে জল-বিদ্যুৎ-বিনিয়োগ এবং কৃষিজ-বনজ-খনিজ সম্পদ মাথাপিছু হারে পাওয়ার সুযোগ নগণ্য হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। ক্রমশ ঐসব মানুষের জীবিকার স্বাভাবিক পথগুলোই শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। আর পেছিয়ে পড়া অঞ্চলে উন্নত প্রযুক্তি নির্বিচারে ব্যবহারের দ্বারা রপ্তানীযোগ্য সম্পদ-গুলো আহরণের মধ্য দিয়েই বনসম্পদ, ভূসম্পদের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে এই সব কৃষি নির্ভর জনগোষ্ঠিগুলি, বছরের পর বছর খরা-বন্যা অনাহারের সঙ্গে লড়াই করে। যোগ্যতমের বেঁচে থাকার বিকাশ ধারায় প্রথমেই অপেক্ষাকৃত দুর্বল হারাচ্ছে তার সব কিছু, এমন কি জল মাটি বেঁচে থাকার পরিবেশ।

আর এপারে, এই নগরে ...

আজকের জীবন ও জীবিকার কঠিন লড়াইয়ের প্রতিযোগিতায় তীব্র হয়ে উঠছে জীবনটাকে আরও আধুনিক করে তোলার আকাঙ্ক্ষা। প্রচারের গুণে গড়ে উঠছে নতুন জীবনবোধ। নব নব ভোগের সামগ্রী একান্তই ব্যক্তিগতভাবে চুটিয়ে 'এনজয়' করা। এই তো 'শিক্ষিত' মানুষের প্রবণতা। এভাবেই 'সংস্কৃতিবান' মানুষের আসে পরিতৃপ্তি। উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ সৃষ্টি করছে নতুন মূল্যবোধ—ফালতু involvement কমিয়ে জীবনে উন্নতি করা। এর জন্য এক একটি আলোর বৃত্ত গড়ে নিয়ে তারই মধ্যে আপন আপন সৌন্দর্য, শিক্ষা, ব্যক্তিত্বচর্চা এবং স্বচ্ছলতার ধান্দা করাই জীবন। টি ভি, ফিচার, পত্রপত্রিকার মাধ্যমে সৃষ্ট দৃষ্টান্তমূলক আকাঙ্ক্ষার ক্রমাগত নিত্য নতুন শিকার আজ 'আধুনিক' গ্রাম শহরের যে কোনও বৃত্তির মানুষ, এমন কি ফুটপাতের শিশু থেকে শুরু করে মাল্টি-স্টোরিডের সন্তান। আর এরই সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমিক কৃষক বিপ্লব করে সমাজকে সুস্থ করবে, সুস্থ রাখবে এই 'মিথ'ও ভেঙ্গে যাচ্ছে এদের কাছে, প্রতিদিন যে গায়ে গতরে শ্রম দেয় তার কাছেও। এই ভাবেই বেড়ে উঠছে জীবন-পরিবেশ আর সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষার অসঙ্গতি। এদের জীবনে আকাঙ্ক্ষার উত্তেজনা ফুরিয়ে গেলে আসে একঘেয়েমি। ফরমায়েসি কাজ ছাড়া সৃষ্টির আনন্দ হারিয়ে যাওয়ায় ফুরিয়ে যায় এদের জীবনবোধ। দেখা দিচ্ছে identity crisis। (এমন কি পোলাণ্ড রাশিয়ায়ও বইয়ের পাতার আইডিয়াল শ্রমিক কৃষক হারিয়ে যাচ্ছে। ফিরে যাচ্ছে একটা কিছুর আশ্রয়ের খোঁজে, তা সে ধর্ম বা যে কোনও নামেই ভাবা হোক!)।

আরবানাইজেশনের দৌলতে গড়ে ওঠা মূল্যবোধের সীমারেখায় দেখা যাচ্ছে আত্মকেন্দ্রিক রক্ষণশীলতা। ধর্মকে মুখে কুসংস্কার বলে লোক দেখানো অস্বীকার করলেও যুক্তিহীন আনুগত্য বোধ করে বিজ্ঞানের কাছে। তাইতো দেখা যায় শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই সামান্য জ্বর, পেট খারাপ, সর্দি হলেই 'ঠিক' ওষুধ খেয়ে নিজের চিকিৎসা করে—দুদিনও সবুর করে না, নর্দমায় মশা হলে নর্দমা সাফ করে না (ছোট কাজ তো!) —গায়ে ওডোনেক্স মাখে, বেগন স্প্রে করে। বৃহত্তর পরিচালন ক্ষেত্রেও এ মানসিকতা দেখা যায়। নর্দমার পাঁক তুলে রাস্তায় ফেলে রাখে—সঙ্গে সঙ্গে তুলে দূরে নিয়ে যায় না, পড়ে পড়ে শুকোয়। খামোকা বৃষ্টি হলে আবার ধুয়ে নর্দমায় যায়। রাজপথের গর্ত ইট ইত্যাদি দিয়ে ভরিয়ে রোলার দেয়। মশা হলে বিদেশী কামান, তেল আসে মশা মারতে—মশা যেখানে জন্মায় তা কিন্তু পরিষ্কার রাখে না। এক জায়গায় আবর্জনা সব জায়গা থেকে নিয়ে এসে কদিন ধরে জমিয়ে ক্রেন দিয়ে তুলে লরী করে শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় (জলপথে কম খরচে বহনের ব্যবস্থা ভাবা হয় না কখনো)। বছরের পর বছর চলে আসা এই প্রক্রিয়াগুলোয় বেশ কিছু উন্নত প্রযুক্তিজাত পণ্য আমদানী করতেই হয় মেট্রোপলিটন সিটিকে সুস্থ রাখতে। এবং আমরাও পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্য (সৌন্দর্য নাই বা বিবেচ্য হোক!) রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হায়ার অথরিটির উপর অর্পণ করেই খালাস। বাস্তবিক, ফালতু কাজে, ভাবনায় সময় নষ্ট করার মত সময় আমাদের নেই। এ শহরের এ এক নতুন মূল্যবোধ। এমনকি, আমরা যারা গণবিজ্ঞান নিয়ে মাতামাতি করি তারাও এই সব তুচ্ছ ব্যাপারে জড়াতে চাই না।

আর তাই যারা জীবিকার হাড়ভাঙা প্রক্রিয়ায় যুক্ত সেই শিশু নারীরা পড়ে থাকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আর এগিয়ে থাকা শিক্ষিতরা গড়ে তোলে বিজ্ঞান মেলা, মিছিল। ওদের চোখে এদের প্রচেষ্টা একদা নবদ্বীপের বাচস্পতিদের তর্কসভা বা নিমাইয়ের নগর-সংকীর্ত্তনের নব্য সংস্করণ ছাড়া নতুন কিছু রূপ পায় না।

এই সামগ্রিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে দেশে দেশে নতুন ভাবনা চিন্তার সূত্র ধরে আমরাও এগিয়েছি পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে। যেখানে যেটুকু সামর্থ্য স্লাইড, পোস্টার, বক্তব্য সম্বল করে পৌছতে চেয়েছি যারা দূষণের শিকার অবক্ষয়ের ভুক্তভোগী তাদের কাছে। সেখানে আজ অনেক দাবিদার। গণবিজ্ঞান আন্দোলন পরিণত হতে চলেছে সরকারী আন্দোলনে। সরকার থেকে গাছ বসানো, পদযাত্রা, বিজ্ঞান প্রযুক্তি তদারকী ব্যবস্থা, কালার্ড ভিডিও শো এবং নামী দামী বিজ্ঞানী স্টার হিসাবে উপস্থাপিত করা শুরু হয়ে গেছে। বৃহৎ শিল্পগুলিও নেমে পড়েছে 'পরিবেশ রক্ষা'র স্বার্থে। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান আন্দোলন আরও মণিমুক্তো খচিত হয়ে উঠবে বছরের পর বছর, আর দূষণের ভুক্তভোগীরা দেখে যাবে কালচার-বিলাসিতা। আমরা যাদের অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভাবি তাদের জীবনের ঐ পরিবেশে থেকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে অন্ধবিশ্বাস, ভয়, আনুগত্য, অক্ষমতাবোধ জড়িয়ে টিঁকে থাকবেই। প্রযুক্তি যদি তাদের স্বাবলম্বী হতে শেখায় তবেই বাঁচতে শিখবে। আর তখনই সেই পথ খুঁজে পাবে সম্মিলিত সক্ষমতায়। চিপকো আন্দোলনে নারী শিশুরা গাছ জড়িয়ে ধরেছিল অনন্যোপায় হয়ে। যদিও আমাদের চোখে ওরা অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তবুও এটা প্রমাণিত ওদের সামাজিক মূল্যবোধ জীবনের প্রতি মমত্ববোধ 'শহুরে' মানুষদেরকে কথার মালায় বোঝানো যায় না।

আমরা কি পারবো?

এই অবস্থায় যতদিন না বিজ্ঞান আন্দোলনের মূলকে মাটিতে রস

নেওয়ার জন্য গ্রথিত করা যাবে ততদিন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ভাসাভাসাই থাকবে। বিজ্ঞান আন্দোলন এবং 'ছোট' 'নীচু' কাজের মানুষদের ফারাক বাড়তেই থাকবে। কেননা একজন ছোট কাজের মানুষের চোখে প্রযুক্তির যতো উন্নতি মানুষ ও পরিবেশ তথা জীবনের ততো ক্ষতির সম্ভাবনা এবং urbanised সভ্যতায় শিক্ষিত বিবেকহীন মানুষ বেড়ে ওঠার সম্ভাবনা। বিজ্ঞানের এই স্ববিরোধিতার মধ্যে নিহিত আছে গণবিজ্ঞান কর্মীদের দায় ও দায়িত্ব। মানুষের অস্তিত্বের স্বার্থেই উপযুক্ত প্রযুক্তি খুঁজে নিয়ে কোথায় কিভাবে কাজে লাগানো যায় তাই আজ সবচেয়ে জরুরী। এজন্যই বিজ্ঞান আন্দোলনকে স্থানীয় উৎপাদনের সঙ্গেও জুড়ে নিতে হবে। এলাকাভিত্তিক সার্ভে করে স্থানীয় স্কুল, কলেজ, ক্লাব যেখানে সম্ভব সেখানেই নতুন প্রজন্মের কাছে দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে হবে। প্রথম প্রথম খুবই একঘেয়ে কাজ হবে, কিন্তু নিরাশ হওয়ার অবস্থা আদৌ নয় কেননা চতুর্বর্গ জাতব্যবস্থার মধ্যে শত শত বৎসর মানুষকে গতিহীন, যুক্তিহীন, ইহকাল-উদাসীন এবং কর্মশীলদের সবার নীচে অবদমিত রাখার পরেও সেই মানুষের উত্তরপুরুষরা আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ধারাবাহিকতায় আত্মসচেতন হয়ে উঠছে, চতুর্বর্গ প্রথা ভেঙে কিছু কিছু অধিকার জয় করতে পেরেছে।

আজকের এই অবস্থায়, অবৈজ্ঞানিক উন্নতির ধাক্কায় দুর্দশাগ্রস্ত গ্রাম, পল্লী বা যে কোনও নির্দিষ্ট এলাকার জীবন ও পরিবেশের স্বার্থে প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুযায়ী এলাকার অভিজ্ঞ এবং দায়িত্বশীল মানুষদের সঙ্গে মিলে, স্থানীয় ভিত্তিতে বিকল্প উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছাড়াও, কিছু না কিছু করা সম্ভব—

1. পানীয় জলের ব্যবস্থা করা।
2. স্বাস্থ্য রক্ষার স্বার্থে এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
3. জল নিকাশী ব্যবস্থা ঠিক রাখা।
4. জলসেচের ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
5. পুকুর ইঁদারা সংস্কার করা। মাছ চাষ করা।
6. বিকল্প জ্বালানী—সূর্যালোক, বাতাস, বর্জ্য ব্যবহার করে।
7. খেলার মাঠ, গোচারণ ভূমি রক্ষা করা।
8. কৃষিক্ষেতে কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করা।
9. শিল্পজাত দূষণ রোধ করা।
10. জ্বালানী গাছ বসানো। বিষাক্ত গাছ ধ্বংস করা। ইত্যাদি।

সামান্য হলেও এর মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে নতুন জীবনচর্চা। সমষ্টির মধ্যে সমাজের বিকাশই পারে ব্যক্তিত্বকে সক্ষম করে তুলতে। শুরুতে একা হলেও নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই একে একে সবাই এগিয়ে আসবেন। এই নতুন পথের বিজ্ঞান আন্দোলনের মধ্য দিয়েই যারা কাজ করে তারাই সঠিক ভাবে মানুষ ও পরিবেশের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে। নচেৎ, আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হলেও কায়িক পরিশ্রমের ভূমিকার হেরফের মৌলিকভাবে কিছুই হবে না, বিজ্ঞান রয়ে যাবে তাদের থেকে অনেক দূরে প্রযুক্তির অধিকর্তাদের আয়ত্তেই আর বিজ্ঞান আন্দোলনও থেকে যাবে বুদ্ধিজীবীদের খপ্পরেই। □

॥ কারিগরী শিক্ষা : দিশার সন্ধানে ॥

প্রাক-কথন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপ্লব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সামনে তাদের পশ্চাৎপদ জাতীয় অর্থনীতির আধুনিকীকরণের ও তার দীর্ঘ-দিনের দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অশিক্ষা দূর করার সুযোগ এনে দিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, উন্নয়নশীল দেশগুলি কি তার সদ্ব্যবহার করে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারবে? নাকি উন্নত প্রযুক্তির দেশগুলির অর্থ-নৈতিক আধিপত্যের ফাঁস এই সুযোগে আরো চেপে বসবে তাদের গলায়? একদিকে উন্নত দেশের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির স্তরে পৌছনর তাগিদ, অন্যদিকে দারিদ্র্য-সীমার নীচে এক বিশাল জনসমষ্টির ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর দায়—এই আপাত-বিরোধী দুই লক্ষ্যে চালিত হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি।

বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশেই আর্থিক সম্পদ সীমিত, জনসংখ্যা বিপুল। এই জনসমষ্টিকে সম্পদে পরিণত করতে হ'লে দরকার হলো—

(i) দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও রূপায়ণ প্রক্রিয়ায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ; এবং

(ii) শিক্ষার মাধ্যমে তাদের সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ।

ভারতে কারিগরী শিক্ষা

কারিগরীর ক্ষেত্রে এদেশে ত্রি-স্তর শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে :

	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্তর	সংখ্যা মোট	সংখ্যা বেসরকারী	বার্ষিক ছাত্র গ্রহণ ক্ষমতা
I	ডিপ্লোমা স্তর	737	406	1,14,755
II	স্নাতক স্তর	280	161	58,800
III	স্নাতকোত্তর ও গবেষণা স্তর	80	—	

এছাড়া এ. এম. আই. ই. পরীক্ষার ... 1,000

... মাধ্যমে বছরে প্রায় 2,500 জন

ইঞ্জিনিয়ার আসেন এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলি (I T I) থেকে বেশ কিছু টেকনিশিয়ান পাশ করেন।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় বর্তমানে প্রায় 50,000 ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট এবং 70,000 ডিপ্লোমাধারী প্রতি বছর পাশ করেন। দশ বছর আগের সংখ্যার তুলনায় এই সংখ্যা তিনগুণেরও বেশি। গত কয়েক বছরে কারিগরী কলেজ ও পলিটেকনিকের অপরিকল্পিত দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে, বিশেষত দক্ষিণ-ভারতের রাজ্যগুলিতে। নয়াদিল্লীর ইনস্টিটিউট অফ অ্যাপ্লায়েড ম্যানপাওয়ার রিসার্চের দুই কর্তাব্যক্তির মতে এ ধরনের অপরিকল্পিত সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে ইঞ্জিনিয়ারদের কর্মসংস্থান গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

দুটি ধাঁধাঁ

বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ কারিগর বাহিনীর দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের প্রযুক্তি আমদানি করতে হয়। করতে হয় সেই সব উন্নত দেশগুলি থেকে, যেখানে আবার আমাদেরই সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রযুক্তিবিদদের একটা বড়ো অংশ নিযুক্ত রয়েছে। অথচ এই বহির্গামী প্রযুক্তিবিদদের মেধাকে দেশের প্রযুক্তির স্তর উন্নত করার কাজে লাগানোর উপযুক্ত চেষ্টা হচ্ছে না।

আমাদের দেশে একটা সংস্কৃত প্রবচন আছে—"বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্।" অথচ তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের একাংশের মধ্যে দেশের মানুষ ও তাদের বিচিত্র জীবনধারা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকট। আজকের পরিস্থিতির বদল যদি আমরা চাই তবে আগে এ দুটি ধাঁধাঁর সমাধান প্রয়োজন।

কারিগরী কর্মক্ষেত্রের রূপরেখা

ভারতের বিশাল কারিগরী জনশক্তি (technical manpower) কিভাবে কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত রয়েছে সেই তথ্য নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্ব-ভারতের বোর্ড অফ প্র্যাকটিকাল ট্রেনিং-এর একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায় :

i) পর্যবেক্ষক (supervisor) স্তরের 40 শতাংশ পদে নিযুক্ত রয়েছেন এমন সব ব্যক্তিরা যাদের কারিগরী শিক্ষা নেই। অনেক ক্ষেত্রে এর কারণ —আন্দোলন ও অন্যান্য চাপে পদোন্নতি।

ii) কারিগরী স্নাতকদের 10 শতাংশ এমন পদে নিযুক্ত যেগুলিতে কারিগরী ডিপ্লোমাধারীদের নিযুক্ত থাকার কথা।

iii) শিল্পে নিযুক্ত বেশীর ভাগ কারিগরী স্নাতকরাই বাঁধাধরা একঘেয়ে কাজেতে রয়েছেন।

iv) মাত্র 2.5 শতাংশ ইঞ্জিনিয়ার গবেষণায় (R & D) যুক্ত।

অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের কারিগরী জনশক্তির একটা তুলনামূলক [illegible] নিশ্চয়ই প্রাসঙ্গিক [সারণী দেখুন]।

সারণী থেকে [illegible] দেখা যাচ্ছে যে আলোচিত ছয়টি দেশের মধ্যে বিশ্লেষ[illegible] বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের সংখ্যায় [illegible] দক্ষ কারিগর-কারিগরী-জনসংখ্যায় এবং গবেষণারত বি[illegible] ভারতবর্ষ যথেষ্টই পিছিয়ে রয়েছে। উপরন্তু প্রতি বছরই [illegible]

দেশ	মাধ্যমিক বিদ্যালয়গামী বয়সের শিশুদের যত অংশ বিদ্যালয়ে যায়	জনসংখ্যার যত অংশ কারিগরী স্নাতক	গবেষণারত বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা কর্মী বাহিনীর যত অংশ
	(%)	(%)	(%)
ভারতবর্ষ	30	0.02	0·02
জাপান	92	0·62	0·57
সোভিয়েত ইউনিয়ন	96	1·19	0·90
ইংল্যাণ্ড	83	0·23	0·37
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	91	0·30	0·64
পশ্চিম জার্মানী	70	0·11	0.49

সূত্র : 1983 UNESCO Statistical Yearbook

বাহিনীর একটা বড়ো অংশই দেশে পছন্দমতো কাজ না পেয়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সর্বাধিক বিশেষজ্ঞ সরবরাহ করে থাকে এই ভারতবর্ষ—প্রতি বছরে 4,000 থেকে 5,000 জন।

প্রচলিত কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা

"প্রচলিত বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা উপযুক্ত ধাঁচের কর্মীবাহিনী অথবা উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গী ও স্থানীয় সমস্যা সমাধানের দক্ষতা—এর কোনোটাই তৈরী করতে পারেনি। উপরন্তু প্রথাগত প্রযুক্তি ও দেশীয় দক্ষতার প্রতি অবজ্ঞার ফলে মানুষের আত্মবিশ্বাসের অবনতি ঘটেছে এবং জীবনে বাস্তব সমস্যা মোকাবিলা করার থেকে প্রযুক্তিবিদদের বিচ্ছিন্ন করছে।"—এই অভিমত প্রকাশ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ Y. Nayudamma ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স (ইণ্ডিয়া) আয়োজিত বিশ্বেশ্বরাইয়া স্মৃতি বক্তৃতায়।

বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অরুণ কুমার শীল সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, "আমাদের নিজস্ব সমস্যা, আমাদের সম্পদ এবং কিভাবে আমাদের নিজস্ব দক্ষতা ব্যবহার করে এগুলির সদ্ব্যবহার করা যায়—এ সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দিতে বা জানতে আমরা আগ্রহী নই। কারণ আমরা এগুলির সঙ্গে পরিচিত নই ; আমরা নিজেদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে জানিনা এবং জানতে আগ্রহীও নই। আমাদের সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা এমন কোনো দেশের থেকে বেশি সহায়তা প্রত্যাশা করতে পারি না যাদের চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনধারা আমাদের থেকে অনেক আলাদা। সমস্যার সমাধান আমাদের নিজেদেরই খুঁজে বের করতে হবে।"

এই সব কিছুই ইঙ্গিত করে যে আমরা এখনও আমাদের ঔপনিবেশিক মানসিকতাকে পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলতে পারিনি। সে কারণেই মুষ্টিমেয় ইংরেজী বলিয়ে এলিটদের পক্ষে সমাজের প্রায় সব ক'টি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ-গুলিতে আধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও।

বৈদিক যুগে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত শিষ্যদের গুরুগৃহে শিক্ষার অঙ্গ হিসাবেই প্রচুর দৈহিক পরিশ্রম করতে হতো, এমন কি পল্লীতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে হতো উদরপূর্তির জন্য। ছাত্রদের অহংকারকে অতিক্রম করার জন্যই ছিলো এই ব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক চীনেও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় দৈহিক শ্রম ও জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় এ ধরনের সংযোগ প্রায় অনুপস্থিত। এমন কি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিল্পসংস্থার মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগও ভারতবর্ষে অপ্রতুল।

আরেকটি সমস্যা হলো বিশেষীকরণ (specialisation) ও উপ-বিশেষীকরণের (sub-specialisation) মাধ্যমে বিষয়গুলি ক্রমশ আরো খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ হতে থাকে। এর ফলে একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে। পাঠ্য বিষয় কম রেখে সেগুলিতে ছাত্রদের ব্যুৎপত্তি অর্জন করানোর চেষ্টার পরিবর্তে বহু বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেবার প্রবণতার ফলে ছাত্রদের মধ্যে পল্লবগ্রাহিতা দেখা দিচ্ছে।

1981 সেন্সাস অনুযায়ী ভারতবর্ষে 75% নারী ও 53% পুরুষ নিরক্ষর। অর্থাৎ আমাদের উচ্চশিক্ষার সুউচ্চ কাঠামোটি মোটেই প্রাথমিক শিক্ষার মজবুত ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রযুক্তি-হস্তান্তর না যথোপযুক্ত প্রযুক্তি নির্বাচন, মুষ্টিমেয় ব্যক্তির বিলাসিতা মেটানো না গোটা সমাজের চাহিদা মেটানো—এর কোন লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিচালিত হবে, এসব বিষয় নিয়ে আজ মানুষের মধ্যে সচেতনতা দেখা দিয়েছে। অথচ এই সমস্ত সজীব বিতর্কের কোনো প্রতিফলন বা কত বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি একই কাজে ব্যবহৃত হ'তে পারে তা এই প্রথাগত কারিগরী শিক্ষায় জানা যায় না। আধুনিকীকরণ আর পশ্চিমীকরণ (westernisation) সমার্থক—এমন একটা ধারণা আর প্রথাগত ও দেশীয় প্রযুক্তি-শিল্পের প্রতি অবজ্ঞা এই শিক্ষাব্যবস্থায় গড়ে ওঠে।

কোকিলের ডিম অথবা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিষ্ঠানকে (যেমন : আই. আই. টি., আই. আই. এস.) centres of excellence হিসাবে তৈরী করা হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই বিদেশী সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতায়। বিপুল অর্থ তাদের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে উচ্চমানে পৌছোবার জন্য। অন্যদিকে বাকি বিপুল সংখ্যক কারিগরী কলেজ অর্থাভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে। বলা হয় IIT-গুলির প্রধান কাজ গবেষণা এবং গবেষণার উপযোগী ইঞ্জিনিয়ার তৈরী করা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কি ঘটছে ? ক'জন সেখানকার কারিগরী স্নাতক গবেষণায় যায় ? Management-এর দিকে প্রবল ঝোঁক ও elitist দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য IIT-গুলি আমেরিকান শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ইঞ্জিনিয়ার এবং ভারতীয় শিল্পগুলিকে ম্যানেজার সরবরাহ করে থাকে। তাদের পাঠক্রম, শিক্ষাপদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্যমুখী—এ দেশের বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ফলে ভারতীয় পরিবেশে কাজ করার মানসিকতা ছাত্রদের গড়ে ওঠে না।

বরং রাজ্য ও আঞ্চলিক স্তরের কারিগরী কলেজগুলির বহু ছাত্রের মধ্যে গবেষণা ও পঠন-পাঠনের প্রবণতা দেখা যায়। প্রতি বছর IIT স্নাতকদের প্রায় 20% বিদেশযাত্রা করে। এভাবে ক্রমশ এই প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বিদেশী নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সংযোগ ও প্রভাব বাড়তে থাকে। কার্যত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে মার্কিন এবং বিদেশী ভাবধারা ও প্রযুক্তি বিস্তারের কার্যকরী মাধ্যম হয়ে ওঠে এ ধরনের elitist শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা। কাকের বাসায় কোকিলের ডিম লালন করার মতো এ প্রতিষ্ঠানগুলি কতটা দেশের প্রয়োজন মেটাচ্ছে আর কতটা উন্নত দেশগুলির বীজতলা হিসাবে কাজ করছে—এর হিসাব নেবার বোধহয় সময় এসেছে।

স্বনির্ভরতার প্রচেষ্টা

ভারতবর্ষে শিল্পায়নের প্রথম দিকে বিদেশী নক্শার অনুকরণ করার মধ্যেই ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ প্রধানত সীমাবদ্ধ থাকলেও এতদিনে তাঁরা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের (technology transfer) কৌশল আয়ত্ত করে ফেলেছেন। ভারতীয় ইঞ্জিনিয়াররা আর শুধু প্রযুক্তির 'know-how' পেয়েই সন্তুষ্ট নন, সেই সঙ্গে 'know-why' অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বটিও তাঁরা শেখাতে বিদেশী collaboratorদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে সফলও হচ্ছেন। আশির দশকে ভারতবর্ষ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিশ্বে দশম স্থানে পৌছেছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও স্বাধীনতার চার দশক পরেও ইস্পাত, সিমেন্ট, সার ও তাঁতশিল্প (textile)—এই চারটি প্রধান শিল্পে ভারত এখনও পুরোপুরি স্বনির্ভর হতে পারেনি। এখনও গ্রহীতা দেশের আরোপিত শর্তে ভারতকে বিদেশী ঋণ ও প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বহুজাতিক সংস্থাগুলি থেকে।

সদ্য স্বাধীন দেশগুলির রাষ্ট্রনেতারা দেশকে রাতারাতি বদ্‌লে দেবার মতো আর্থিক সামর্থ্য পাননি। সেজন্য তাঁরা ছোটো একটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন শুরু করেন এই আশা নিয়ে যে এর সুফল অতি দ্রুত গোটা সমাজেই পরিব্যাপ্ত হবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে নি। পুঁজি-নির্ভর আধুনিক শিল্প বিকশিত হয়েছে এবং একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীকে প্রচুর আয়ের সুযোগ দিয়েছে। এই শ্রেণীটি অনেক ক্ষেত্রে কৃষিজীবী ও দুর্বলতর শ্রেণীর সরাসরি ক্ষতির বিনিময়েই বিকশিত হয়েছে। শুকিয়ে যেতে থাকা গ্রাম ও মফস্বলের ভিটে মাটি থেকে ছিন্নমূল হয়ে নগরের ফুটপাতে ও বস্তিতে ভিড় করছে বিশাল সংখ্যক মানুষ। একপেশে উন্নয়নের ফলেই স্বাধীনতার চার দশক পরেও অধিকাংশ ভারতীয় ক্ষুধা, অশিক্ষা ও রোগের সহজ শিকার।

মহাত্মা গান্ধী 1920 সালেই পাশ্চাত্য ধাঁচের নগর ও বৃহৎ-শিল্প-ভিত্তিক উন্নয়ন পন্থার কুফল লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি পঞ্চায়েত রাজ অর্থাৎ তৃণমূলের গণতন্ত্রকে মজবুত করার মাধ্যমে গ্রাম-ভিত্তিক উন্নয়নের

ওপর বিশেষ জোর দেন। সমাজতান্ত্রিক চীনে মাও সে তুঙ আরোপিত শিল্পায়নের পরিবর্তে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করে, তার উদ্বৃত্তকে শিল্পায়নে ব্যবহার করেন।

কারিগরী শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু প্রস্তাব

কারিগরী শিক্ষা শুধুমাত্র কয়েকটি দামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আবদ্ধ থাকলে চলবে না, বিদ্যালয়ের ও বয়স্ক শিক্ষার পাঠক্রমে জনসাধারণের ব্যাপক অংশকে কারিগরী শিক্ষা দেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের পরম্পরাগত কারিগরী দক্ষতা ও সম্পদগুলিকে পরিশীলিত ও উন্নত করতে হবে। সমস্ত ধরনের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পকে উন্নত করার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাও এক্ষেত্রে একটি জরুরী ইতিবাচক উপাদান।

বিশেষ জ্ঞানের অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি বিষয়ে জোর দেবার বদলে ছাত্রেরা যাতে বিষয়টির মূলনীতিগুলিতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে সেদিকে লক্ষ্য দেয়া উচিত। অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের মতে, "The development of general ability for independent thinking and judgement should always be placed foremost, not the acquisition of special knowledge. If a person masters the fundamentals of his subject and has learnt to think and work independently, he will surely find his way." শুধুমাত্র অতিরিক্ত তথ্য ছাত্রদের বুদ্ধিমান করতে পারে হয়তো, কিন্তু প্রাজ্ঞ (wise) করতে পারে না।

কারিগরী পাঠক্রমে বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলির চর্চা আরো গভীরভাবে হওয়া দরকার। এছাড়া পাঠক্রমে পরিবেশ বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের চর্চার ওপর জোর দেয়া দরকার। কারণ সমাজ, সংস্কৃতি ও পরিবেশের ওপর কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কি ধরনের হতে পারে—এসব বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে পরিকল্পনার সময় এই সমস্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে প্রকল্প রচনা সম্ভব হবে না। বিভিন্ন ধরনের জটিল সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে কারিগরী শিক্ষাকে এমনভাবে সাজানো দরকার যাতে বিভিন্ন কারিগরী শাখার মধ্যে বোঝাপড়া ও আদান প্রদান বৃদ্ধি পায় এবং কোনো জটিল সমস্যার সমাধানের প্রয়োজনে বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞরা যৌথ প্রচেষ্টা চালাতে পারে।

Extension service-কে কারিগরী শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে রাখা দরকার। প্রতিটি কারিগরী কলেজ অন্তত একটি গ্রামকে বেছে নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে এবং উপযুক্ত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে গ্রামের সামগ্রিক উন্নয়নের চেষ্টা চালাতে পারে। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে ভাবী ইঞ্জিনিয়াররা যাদের কাছে তাদের অধীত বিদ্যার সুফল পৌঁছনো দরকার, তাদের পরিবেশ, জীবনধারা, সংস্কৃতি ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পাবে। এর প্রস্তুতি হিসাবে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর থেকেই নানা ধরণের social work-এর মাধ্যমে কায়িক শ্রমকে শিক্ষাক্রমের অঙ্গীভূত করা উচিত।

শিল্প সংস্থাগুলিকে campus-interview-এর মাধ্যমে প্রধানত প্রাক-অন্তিম বর্ষের কারিগরী ছাত্রদের মধ্যে থেকে কর্মী মনোনয়ন করায় উৎসাহিত করা দরকার; যাতে ঐসব ছাত্ররা শিল্পসংস্থাগুলির কাজের সঙ্গে অনেকটা একাত্ম হতে পারে এবং কলেজের অবকাশে তাদের শিল্পে প্রশিক্ষণ আরো অর্থবহ হয়। এছাড়া কারিগরী কলেজগুলির সঙ্গে শিল্প ও গবেষণা সংস্থাগুলির faculty exchange programme সহ সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতাকে সুসংহত করা দরকার।

আমাদের দেশের প্রযুক্তির স্তরকে সত্যিই উন্নত করতে হলে আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শীর্ষের জন্য মজবুত ভিত্তি স্বরূপ প্রচুর দক্ষ টেকনিশিয়ান ও কর্মীর প্রয়োজন। এজন্য আমাদের কারিগরী শিল্পে নিযুক্ত কর্মীবাহিনীকে বিজ্ঞান ও গণিতে পারঙ্গম করে তুলতে হবে। 10+2 স্তর পর্যন্ত শিক্ষা এদের একান্তই দরকার।

শেষ কথার পরিবর্তে

শিক্ষা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতেই থাকবে, তাই এ নিয়ে শেষ কথার কোনো মানে হয় না। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছিলেন, "জ্ঞান হলো শক্তি, কিন্তু এই শক্তি যেমন শুভদিকে যেতে পারে তেমন অশুভ দিকেও যেতে পারে। সুতরাং মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির অনুপাতে প্রজ্ঞাও যদি না বৃদ্ধি পায়, তবে এতে মানুষের দুঃখই বৃদ্ধি পাবে।"

মেধা ও প্রজ্ঞা (wisdom), মানসিক শ্রম ও কায়িক শ্রম, পল্লী ও নগর—এদের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ক্রমবর্ধমান, তাকে ক্রমশ কমিয়ে আনার দিকে লক্ষ্য রেখে কারিগরী শিক্ষার রূপরেখা রচিত হওয়া দরকার। □

প্রবন্ধসূত্র :

1. Paul Harrison, "Third World Tomorrow," Penguin.
2. N. Volkov & R. Zimenkov, "Technological Neo Colonialism," Progress Publishers.
3. C. V. S. Ratnam, "The Eluding Technological Self Reliance", Bulletin of the Institution of Engineers (India), Vol. 35, No. 10.
4. Y. Nayudamma, "Human Resources Development", Visweswaraya Memorial Lecture, Institution of Engineers (India).
5. S. R. Chowdhury, "Growth of Public Sector and its Impact on the Engineer and the Profession", Bulletin of the Institution of Engineers (India) Vol 37, No. 10.
6. A. K. Seal, "Technical Education in India : Problems and Prospects", B. E. College Annual

(BECA), January 1988.
7. Albert Einstein, "Ideas and Opinions," Rupa & Co.
8. P. K. Som, 11th Asoke Sen Memorial Lecture, Institution of Engineers (India).
9. Thought : A Socio Technical Review, Vol II, Issue 1 & 2.
10. R. G. Varshney & B. L. Agarwal, "There is unemployment ahead for engineers", Science Today, May 1984.

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

['বাড়াবাড়ি—দুনিয়া জুড়ে' প্রবন্ধের গ্রন্থপঞ্জীর বাকি অংশ]

University Press, New Delhi, 1976. 12. Michael Redclift—Development and the Environmental Crisis, Methuen, London. 13. Francis Sandbach—Environment, Ideology and Policy, Basil Blackwell, Oxford, 1980. 14. D. R. Kelley—The Economic Superpowers and the Environment, Freeman, 1976. 15. B. Komarov—The Destruction of Nature in Soviet Union, Pluto Press, London, 1980. 16. Langdon Winner—Autonomous Technology, MIT Press, 1977 ; David Dickson—Alternative Technology, Fontana, 1974. 17. Barry Jones—Sleepers, Wake ! Wheatsheaf Books, Brighton, 1982. 18. Andre Gorz—Farewell to Working Class, Pluto Press, London, 1982. 19. Alvin Toffler—Future Shock, Bantam Books, N. Y., 1970. 20. Fritjof Capra—Turning Point, Wildwood House, London, 1982. 21. Lewis Mumford—The Pentagon of Power, Secker and Warburg, London, 1970. 22. Theodore Roszak—Person/Planet, Granada, St. Albans, 1981. 23. E. F. Schumacher—Small is Beautiful, Sphere Books, London, 1974. 24. H. Stretton—Capitalism, Socialism and Environment, Cambridge, 1976. 25. Rudolf Bahro—From Red to Green, Verso, London, 1984. 26. E. Fromm —To have or to be, Abacus, London, 1979. 27. Carolyn Merchant—The Death of Nature : Women, Ecology and the Scientific Revolution, Harper and Row, N. Y., 1980.

With Best Wishes From

P. R. DAS

ENGINEER, 1st CLASS PWD ENLISTED CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIER

31 CHANDMARI ROAD
P.O. Kanchrapara
24 Parganas (N)

With Best Compliments From

ASIT KUMAR ROY & SON

87 ADARSHA PALLI
KHARDAH
Dt. 24 Parganas

॥ ইন্দিরা সাগর প্রকল্প : বিশ্লেষণ ও বিরোধিতা ॥

CAISA হল ভূপালের একটি গণসংগঠন—গণবিজ্ঞান চেতনা প্রসারে যার ভূমিকা উল্লেখ-যোগ্য। তাঁদের প্রকাশিত "ইন্ স্যরো অ্যাণ্ড অ্যাংগার" নামক একটি পুস্তিকার মুখবন্ধের বাংলা অনুবাদ এখানে প্রকাশিত হল—প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় বিবেচনায়।

ক্যাম্পেইন অ্যাগেইনস্ট ইন্দিরা সাগর (CAISA) গোষ্ঠীর কয়েকজন কর্তৃক গৃহীত এবং টেপে তুলে রাখা ইন্টারভিউ-এর ভিত্তিতে বর্তমান প্রতিবেদনটি তৈরি হয়েছে।

আমাদের তরুণদের মধ্যে রয়েছেন বেশ কিছু সাংবাদিক, নানা পেশায় নিযুক্ত মানুষজন, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং বহু সমাজকর্মী, যাঁরা 'ইন্দিরা সাগর বাঁধ' নির্মাণের বিরোধিতায় কৃতসঙ্কল্প।

মধ্যপ্রদেশের নর্মদা নদীর ওপর অন্যতম বড় যে বাঁধটি তৈরি হতে চলেছে তার নাম ইন্দিরা সাগর বাঁধ। কিন্তু সামাজিক, আর্থনীতিক ও পরিবেশগত যে প্রতিক্রিয়া এতে হবার সম্ভাবনা তা একে অন্যতম বৃহৎ পরিকল্পিত ধ্বংসায়োজন বলে অভিহিত করবার পক্ষে যথেষ্ট। নর্মদা উপত্যকা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এ বাঁধ গঠনের কাজ দেখাশোনা করছেন, আর এর জন্য মূল প্রয়োজনীয় টাকা আসছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে। সাধারণ মানুষের দুর্দশাবর্ধক ও পরিবেশ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দুনিয়া জোড়া এ রকম বড় বড় পরিকল্পনা রূপায়ণে বিশ্ব ব্যাঙ্কের উদার অর্থব্যয়ের ন্যক্কারজনক রেকর্ড রয়েইছে। ইন্দিরা সাগর বাঁধ নির্মাণের ফলে স্থানচ্যুত হবেন এক লক্ষ সত্তর হাজারেরও বেশি মানুষ, যাঁদের বেশির ভাগই হলেন 250টি গ্রামের আদিবাসী। এতে তেতাল্লিশ হাজার একর পরিমাণ প্রাকৃতিক বন্যভূমি এবং পঁয়তাল্লিশ হাজার হেক্টরেরও বেশি পরিমাণ উর্বর চাষের জমি জলনিমজ্জিত হবে—যে ক্ষতি অপূরণীয়। এতে বেশ কিছু বন্য প্রাণীর প্রাণনাশ ঘটবে—বিশেষত এমন সব বন্য প্রাণীর, যাদের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই ক্রমশ কমে আসছে। বিশাল জলাধারে রক্ষিত জলজাত সিস্‌মিসিটির জন্য এতে যে ভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবলতর হবে, এদিকটির প্রতিও পরিবেশবিদরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, কারণ বাঁধ তৈরির মনোনীত স্থানটিতে রয়েছে এক অ-স্থিতিশীল ভূতাত্ত্বিক অবস্থা। আর বাঁধ তৈরির ফলে লভ্য উপকারের সম্ভাবনাগুলোও প্রশ্নাতীত নয়। যে ভূমিতে সেচের জল সরবরাহ করা হবে বলে বলা হচ্ছে তার প্রকৃতি এমনই যে এতে প্রায় শতকরা চল্লিশ ভাগ জমিই জলমগ্ন হয়ে থাকবে সবসময়—ফলে তা নষ্ট হবে চিরতরে। আরো লক্ষ্যণীয় যে প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ জমির অগভীর মৃত্তিকাস্তর থাকায় তা-ও সেচযোগ্য হবে না। পরিকল্পিত দু'শ তিরিশ মেগাওয়াট উৎপাদিত বিদ্যুতের ফলভোগী হবেন মূলত বহুজাতিক সংস্থা সহ নানা শিল্প-প্রতিষ্ঠান, যা ধনিকশ্রেণীর স্বার্থ-রক্ষায়ই ব্যয়িত হবে।

এতদিন পর্যন্ত এ ধরনের বাঁধ তৈরির ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ার প্রশ্নে দুটি মূল ধারা লক্ষ্যিত হয়েছে। তার একটি হল: সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্তদের (বা বাস্তুচ্যুতদের) সমস্যাগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এবং তাদের পুনর্বাসন ও গৃহসংস্থানের দাবীতে জনগণকে সংগঠিত করা। অপরটি হল: বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা বা কর্মসূচিকে বানচাল করবার জন্য জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করা। আমরা মনে করি প্রথম ধারাটি গ্রহণের অর্থ হল বাঁধ তৈরি ব্যাপারটিকেই পুরোপুরি মেনে-নেওয়া। এটাও আমরা বিশ্বাস করি যে বাস্তুচ্যুতদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও—যদিও বাস্তবে তা সুদূর-পরাহত—পরিবেশগত বিপর্যয়ের যে গুরুতর দিকগুলো থাকছে তা থেকেই যাবে।

বিদেশী পুঁজির মদতে ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা উন্নয়নের যে পথ গ্রহণ করছে সেই অভিমুখ লক্ষ্য করেই আমরা এই বড় বড় বাঁধ নির্মাণ সমস্যাটিকে বিবেচনা করছি। বড় বড় বাঁধ নির্মাণ মানেই ব্যাপক সেচ পরিকল্পনা, HYV বীজ সরবরাহ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহার, বিপজ্জনক ও ঝুঁকিময় হাই-টেক শিল্পব্যবস্থা, অর্থাৎ উন্নয়নের একটি বিশেষ পথের অঙ্গ বা অংশ—এবং এই বাঁধ-নির্মাণ বিরোধিতার অর্থই দাঁড়ায়, আমাদের কাছে, উন্নয়নের এই পথটিরই বিরোধিতা। গত তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতা আমাদের এই শেখায় যে এ ধরনের প্রগতির ফল হল মুষ্টিমেয় ধনীর হাতে ক্ষমতা ও সম্পদ-উৎসসমূহের কেন্দ্রীকরণ; ফল হল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণকে আরো বেশি বেশি কোণঠাসা করা এবং দেশের বায়ু জল ও স্থল-পরিবেশের নিদারুণ বিপর্যয় ঘটানো। পরিবেশকে আমরা দেখি মানবজীবনের অংশ হিসেবে এবং মানুষের স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত-রূপে। তাই ইন্দিরা সাগর বাঁধ তৈরির বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ হল মৃত্যুর-কারবারী শক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনের সপক্ষে আমাদের এক বলিষ্ঠ বিশ্বাসী উচ্চারণ।

আমরা বিশ্বাস করি যে এই বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণের প্রতিবাদমূলক কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে এর বিরুদ্ধে জনমত গঠন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে এর রূপায়ণ রোধ করা সম্ভব।

আমাদের এই অবস্থান সম্পর্কে আপনাদের মন্তব্য ও মতামতের অপেক্ষায় রইলাম এবং আমাদের কাজেকর্মে আপনাদের সাহায্য ও সমর্থন প্রত্যাশা করি।

□ CAISA

অনুবাদ : সুব্রত ভট্টাচার্য

॥ "উই লাভ ইউ, ডিক"—প্রয়াত রিচার্ড ফাইনম্যানের প্রতি ॥

সুব্রত ভট্টাচার্য

নোবেল প্রাইজটাই কথা নয়, নিশ্চয়—প্রথমও নয়, শেষও নয়। তাহ'লে তো, এ লেখায় সবার আগে নাম করতে হয় আই. আই. র‍্যাবির —যাঁকে 'Nature' [vol. 332, p 110, 10 March 1988] পত্রিকা বলেছে "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পদার্থবিদ্যার নৈতিক বিবেক"; যিনি পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন 1944 সালে, কাজ করেছিলেন ম্যানহাট্টান প্রোজেক্টে রবার্ট ওপেনহাইমারের উপদেষ্টা হিসেবে, পরে অবশ্য মতিগতি ও চিন্তার চাকা পাল্টে গিয়েছিল, শেষদিন পর্যন্ত পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য লড়াই ক'রে গিয়েছেন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন এ বছরের (1988'র) 11 জানুয়ারিতে—প্রায় নব্বই বছর বয়সে। তাঁর স্মৃতি ও কীর্তির প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান জানিয়েও আমাদের অনেকেরই প্রাণের পক্ষপাতিত্ব ছুটে যায় আরেক গতিময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বিজ্ঞান-ব্যক্তিত্বের দিকে—যাঁর নাম রিচার্ড পি. ফাইনম্যান। শুধু আমরা কেন! নিরাবেগ (?) দেশ আমেরিকার ক্যালটেক (পাসাডেনা) ইন্‌স্টিটিউটে তাঁর অনুরাগী ছাত্র-সহকর্মী-বন্ধুরা ফাইনম্যানের মৃত্যুর পর মিলিকন লাইব্রেরির সামনে বিরাট ব্যানার হেডিং-এ তাঁদের আপ্লুত ভাবের প্রকাশ করেছিলেন মাত্র চারটি শব্দে—"We love you, Dick" (Dick ফাইনম্যানের ডাক নাম)। এবং এই LOVE শব্দটা শুধু আমাদের কাছেই নয়—ফাইনম্যানের জীবনেও জুড়ে ছিল, বোধ হয়, অনেকখানি—যার জন্যে Marcus Chown-এর মায়ের কাছে লেখা এক চিঠিতে ফাইনম্যান তাঁর স্বভাবসুলভ সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে এবং অকপটে লেখেন—"...Physics isn't the most important thing. Love is. Best Wishes—Richard P. Feynman." [New Scientist **117**, p 72-73 (10 March 1988)]। এ লেখকের ব্যক্তিগত বোধ ও বিচারে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের পর উৎকর্ষ বিচারে যে প্রথম পাঁচজন পদার্থবিদের নাম করতে হয় তার পয়লা নম্বর হ'লেন রিচার্ড। একই কথা অন্য ভাষায় বলেন ফাইনম্যানের এক বিশেষ ব্যক্তিগত বন্ধু—"To this day physicists of the post-war generation recommend their best students with the mock-modest concession that he or she 'is no Feynman', but ..." [Scientific American 258 (6) pp 38-42, June 1988]।

এ বছরের 15 ফেব্রুয়ারি ফাইনম্যান অ্যামেরিকায় মারা যান, ক্যান্সারে। 1982 সাল থেকেই তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে শুরু করে, যার জন্যে Marcus Chown বলেছেন "he was living on borrowed time." তাঁর অভাব পদার্থবিদ্যার ছাত্র ও বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে এক মস্ত শূন্যতার ছায়া ফেলে।

গবেষণা সংক্রান্ত তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হ'ল তাঁর পি. এইচ.-ডি. থিসিস—যা কোন-এক অজ্ঞাত কারণে আজো অপ্রকাশিত! কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডাইন্যামিক্স-এ তাঁর মৌলিক অবদানের জন্য ফাইনম্যান পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান 1965 সালে—সহ প্রাপক ছিলেন সে বছরে আরো দু'জন। তাছাড়াও, তত্ত্বীয় কণা-পদার্থবিদ্যায় উইক ইন্‌ট্যারঅ্যাকশন বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণা, তরল হিলিয়াম তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক কাজ, কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মৌলভিত্তিতে তাঁর ভাবনাচিন্তা এবং সবশেষে, প্রোটন-প্রোটন ও ইলেকট্রন-প্রোটন স্ক্যাটারিং সংক্রান্ত পরীক্ষামূলক কাজে তাঁর প্রস্তাবিত স্কেলিং তত্ত্বের (যা নিয়ে বিতর্ক আজও অব্যাহত) মৌলিকতা, প্রভৃতি কাজের জন্য পদার্থবিদ্যার ইতিহাসে তিনি দীর্ঘ, দীর্ঘ-দিন স্মরণীয় হ'য়ে থাকবেনই। শুধু পদার্থবিদ হিসেবেই নয়, পদার্থবিদ্যার একজন অতি যোগ্যতম শিক্ষক হিসেবেও ফাইনম্যানের তুলনা পাওয়া কঠিন। যাঁরাই ছাত্র হিসেবে সরাসরি তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই তাঁর শিক্ষণশৈলী ও প্রতিভার চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হয়েছেন। যাঁরা সরাসরি আসেননি, তাঁরাও তাঁর সেই অসাধারণ দক্ষতার গন্ধ পান ফাইনম্যানের [ক্লাশ-নোট মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত] একটি গ্রন্থের কয়েক ভল্যুমে, অর্থাৎ Feynman Lectures-এর কয়েক ভল্যুমের পাতা ওল্টালেই। ভীষণ জটিল বিষয়কেও কত স্বচ্ছ ও সাবলীল ভংগীতে উপস্থাপনা করা যায় তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ হ'লেন রিচার্ড। আবার তাঁর বন্ধুর ভাষায় বলতে হয়—"...it is impossible to evoke him without the word 'theatrical'. Richard's was the stage where dancers, wire-walkers and magicians daringly perform. What they do is striking, and not dissembled or illusory. It is real, whole, expressing mastery of some challenge, trivial or urgent, posed by nature and human perceptions. On that stage he performed in four real dimensions."

পদার্থবিদ্যার বাইরেও অনেক 'গুণের' অধিকারী ছিলেন রিচার্ড। স্পষ্টতই তিনি ছিলেন এক দক্ষ সুবক্তা, চমৎকার গল্প বলিয়ে (ranconteur), শিল্পী, সংগীতরসিক, পশ্চিমী নৃত্যকলাপটু, যন্ত্রকুশলী, পাক্কা জুয়া খেলোয়াড়, মজার মানুষ, মিশুক মানুষ, আড্ডাবাজ, আবার ভীষণ জেদী এবং সর্বার্থেই ও সর্বাংশে সাচ্চা আমেরিকান। শুধু তাই নয়—পাক্কা ইয়াংকিও!

এই 'ইয়াংকি' শব্দ-ব্যবহারটিতে বাধ্য হতে হওয়ায় এশীয় আবহাওয়ায় বেড়ে-ওঠা আমাদের বড্ড হোঁচট খেতে হয়—সাধারণ বোধে, বড়ত্ব, মহত্ব ও এ শব্দটির মধ্যে একটা বিরোধিতার ভাব জেগে ওঠে—আমাদেরও

খুঁতখুঁতুনি থেকে যায় যে এরকমটা বোধ হয় না-হ'লেই ভালো হ'ত! কারণ মার্কিন দেশে বড় হ'য়ে ওঠা একজন সংস্কৃতি-সম্পন্ন মানুষও বাহাদুরির ভংগীতে বললে বলতেই পারেন: "Caltech professor goes to see topless dancing six times a week" এবং সেটা রিচার্ড ফাইনম্যান সম্পর্কেই! আর এটা ছিল একটা খবরের কাগজের [দৈনিকীর] একদিনের হেডলাইন! এবং এ সংবাদে কোনো মিথ্যে নেই। ফাইনম্যান সগর্বে প্যাসাডেনার এক topless restaurant-এর হ'য়ে সওয়াল করেছিলেন কোর্টে—একমাত্র খরিদ্দার সমর্থক। এতে সাহসিকতার নজির থাকতে পারে—কিন্তু কতটা সুরুচির, সেটা অবশ্যই প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে, অন্তত আমাদের ভারতীয় বিচারে। মজাটা হ'ল এই যে, সেই বক্ষোন্মুক্ত নারীদেহের নাচ দেখতে দেখতেও সেখানে বসে তিনি কখনো অঙ্ক কষতেন, কখনো সুন্দরী নর্তকীদের প্রোফাইল স্কেচ করতেন, আবার কখনো কখনো সক্রিয় নাচানাচিতেও অংশগ্রহণ করতেন; এবং সপ্তাহের 5।6 দিনের সন্ধ্যা ও প্রথম রাত ব্যয় করতেন ওখানে, প্রায় নিয়মিতই! যদিও মৃতজন সম্পর্কে কোনো অশিষ্ট উচ্চারণ সৌজন্য-বিরোধী, তবু, ফাইনম্যানের এই বিশেষ দিকটিকে আমরা কিছুতেই অনুমোদনযোগ্য মনে করতে পারি না। সব শ্রদ্ধা সত্ত্বেও একথাটা, সত্যের স্বার্থে, লিখতেই হয়।

আরেকটি ব্যাপারেও ফাইনম্যান সম্পর্কে অনেকের সংশয় থাকতে পারে, আছেও। ঠিকই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে লস আলামসে নিউক্লিয়ার অস্ত্র গবেষণায় তিনিও অংশ নিয়েছিলেন—আরো অনেক বাঘা-বাঘা নামজাদা পদার্থবিদের মতোই। কিন্তু, সেটাই সব কথা নয়। সাধারণ কৌতূহল, পরিস্থিতির চাপ, পারমাণবিক শক্তির অপব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব প্রভৃতি অনেকগুলো কারণে অনেকেই সে সময় বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তাই, পরবর্তী জীবনের হিসেব-নিকেশ বাদ দিয়ে সে-সময়ে অস্ত্র-গবেষণা-নিযুক্ত বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীদের সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত নেতিবাচক সিদ্ধান্তে আসাটা হবে পুরোপুরি একপেশেপনা এবং ফাইনম্যানের ক্ষেত্রে তা হবে আরো অন্যায়, কারণ, সে সময় তিনি বয়সে ছিলেন প্রায় সর্বকনিষ্ঠ—প্রি-পি. এইচ.-ডি. ছাত্র মাত্র। সুতরাং, নীতি নির্দ্ধারণে তাঁর যে কোনো ভূমিকাই ছিল না সেটা আর বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। এবং এই পরবর্তী জীবনের হিসেব-নিকেশ করতে গেলেই ফাইনম্যানের সংগে ম্যারে গেলম্যানের বা ফাইনম্যানের সংগে সমবয়সী অন্য পদার্থবিদ বা বিজ্ঞানীদের মৌলিক পার্থক্যটা ধরা পড়ে। তা পড়ুক! পরবর্তী জীবনে পরিণত মনস্কতায় অস্ত্র তৈরির কাজে স্বনিযুক্তির প্রশ্নটিকে তিনি শেষ পর্যন্ত কী চোখে দেখেছিলেন সে বিষয়ে কোনো প্রামাণ্য তথ্য এখনও আমাদের হাতে নেই। কিন্তু তাঁর মতো অকপট মানুষের কাছ থেকে এটা খুবই প্রত্যাশিত ছিল যে তিনি হয় আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন, না-হয় কঠোর আত্মসমালোচনা করবেন—কিন্তু কোনোটাই এ পর্যন্ত আমাদের নজরে পড়েনি। এ আক্ষেপটা থেকেই যায়। ফিরে আসি ফের আগের কথায়।

যাই হোক, তাঁর অভিনবত্ব ছিল সার্বিক দৃষ্টিভংগীতে, মেলামেশা, চলাফেরা, কথাবার্তা, হাবভাব ও কাজে-কর্মে। শোনা যায়, অতি সহজে মিশতে পারতেন সবার সংগে—তিনি প্রিন্সটন-স্ল্যাক-হার্ভার্ড-অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ-কাঁপানো বুদ্ধিজীবীই হোন বা ক্যালটেক প্যাসাডেনার বাগানের মালীই হোন এবং এ মেলামেশার সর্ত একটাই "that you be yourself, that you approached the man and not the myth." নোবেল পুরস্কার পাওয়া ব্যাপারটা, শোনা যায়, তাঁকে বারে বারে বিরক্তি ও অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছে, তিনি বলেছেন হতাশার সুরে যে "এখন তো আর লোকে আমার কথা শুনতে আসে না চিড়িয়াখানার জীব দেখতে আসার মত ক'রে আমাকে দেখতে আসে মাত্র—যেটা আমি ভী-ষ-ণ অপছন্দ করি"। খোদ মার্কিন মুল্লুকে নোবেল-প্রাপ্ত বিজ্ঞানীদের সংখ্যা তো অনেক—নামী প্রতিষ্ঠানগুলোয় প্রায় সব ক'টিতেই খুঁজলে অন্তত এক আধ ডজন হয়তো পাওয়া যাবেই; বিশেষ ক'রে সব বিষয়গুলো ধরলে। তাহ'লে ফাইনম্যানকে দেখতে (বা তাঁর কথা শুনতে) এত ভিড় হওয়ার কারণ কী—তাঁর এই অপরিসীম জনপ্রিয়তার উৎসটি কোথায়—শুধু তাঁর রূপ-লাবণ্য? সবটাই তা কিন্তু নয়। অবশ্য, ফাইনম্যানের চোখা এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বকে খুব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন রবার্ট পি. ক্রিজ এবং চার্লস্ সি. ম্যান তাঁদের "দ্যা সেকেণ্ড ক্রিয়েশান" গ্রন্থে। ভাষাটা ইংরেজিতেই তুলে ধরছি—"Tall and sparcely built, with thick long gray hair combed straight back over the skull, he has a face marked by years of vivid internal experience and a bold, precise, intense, and almost imperious manner of speaking. He walked with the jaunty, hips-out stride of a young blade checking out a bar the day after pay day···A pair of glasses rested at an angle in his shirt pocket. His dislike of interviews has increased since the Noble Prize made him willy-nilly into a media figure, his voice was edgy, suspicious, ridged with theatrical intonation." লক্ষ্য ক'রে দেখুন, ক্রিজ ও ম্যান সাহেবরাও কিন্তু তাঁর (ফাইনম্যানের) বর্ণনায় 'theatrical' শব্দটি বর্জন করতে পারেননি। কিন্তু এই কি সব? না, তা নয়। আসলটি আছে অন্যত্র। প্রায় কোনো ব্যাপারেই তিনি চলতি মত ও পথকে অপরীক্ষিত ভাবে গ্রহণ ক'রে নেননি—এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন চূড়ান্ত অনমনীয়। ফলে, অনেক সময়ই তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের হোমড়া চোমড়াদের ও মার্কিন প্রশাসনের প্রতি তাঁর বিরূপতা চরমে পৌঁছেছে এবং পরের ক্ষেত্রের প্রশ্নে তার শেষ উদাহরণ হ'ল মার্কিন "চ্যালেঞ্জার ডিজাস্টার"-এর তদন্ত কমিটিতে থাকা অবস্থায় (একমাত্র প্রতিনিধি তিনি, যিনি NASA-র সংগে সম্পর্কিত নন) তাঁর মন্তব্য। যার উল্লেখ করেছেন Marcus Chown তাঁর লেখায় এবং এই ভাষায় যে "he was the toughest critic, accusing it (NASA/US

administration—author) of playing Russian roulette in its approach to safety"। এর বিশদ তথ্য পাওয়া যাবে—"Physics Today"-র 41 (2) p 26 February 1988 সংখ্যায়। প্রায় সব বিষয়েই একটা অদ্ভুত স্বকীয়তা তাঁকে পরিণত করেছে এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বে—যার জন্যেই হয়তো তিনি এত জনপ্রিয় এক প্রবাদ-প্রতিম পদার্থবিদ ও অসাধারণ মানুষ হিসেবে, যার জন্যে Marcus Chown তাঁর অবিট লেখার শিরোনাম দিয়েছেন "Physics with a human touch"। ফাইনম্যানের প্রতি শ্রদ্ধার মূল কারণ, বোধ হয়, এই ব্যক্তি মানুষ ফাইনম্যান—যে মানুষ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত thoroughly unpretentious এবং এই একটি শব্দই যাঁর ব্যক্তিত্বের পূর্ণাধার।

অবশ্য, তাঁর আর একটি বিষয় যা উল্লেখ-না-করলেই-নয় এবং যেটা তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধামিশ্রিত অপরিসীম দুর্বলতার মূল কেন্দ্রবিন্দু তা হ'ল : বৈজ্ঞানিক সততার প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা (ইংরেজিতে যাকে বলা যায় professional integrity) এবং সব রকমের 'সংস্কার'-এর প্রতি আপোষহীন বিরোধিতা—সে সংস্কার যতই বিজ্ঞানের (বা ছদ্ম বিজ্ঞানের) পোষাক পরে আসুক-না-কেন। অ্যাস্ট্রোলজি, ই. এস. পি. এবং নানা ধরনের মিষ্টিসিজ্‌ম-এর তিনি ছিলেন তীব্রতম বিরোধী। আর সেটা শুধু মৌখিক নয়—একান্ত আন্তরিক এবং প্রকাশ্য ; স্পষ্ট ভাষায় এসব সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত—"…I have concluded that it's not a scientific world." এবং চিন্তার এই বিশাল বিচরণ ক্ষেত্রে তাঁর ভাব-তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এবং আমাদের ভাবনার সুর ও ছক, আশ্চর্য্যজনকভাবে, একই ছন্দে মিলে যায়।

ফাইনম্যান-চরিত্রের এ প্রগতিশীল দিকটি এবং তাঁর পূর্ণ-বিকশিত ব্যক্তিসত্তার স্বারূপ্য ও মহিমা—তাঁর সব ইয়াংকি-প্রবণতা ছাপিয়েও—পৃথিবীর বিশালতম বিজ্ঞান কর্মীদেরই মুগ্ধ ও আবিষ্ট করে এবং স্পষ্টতই আমরাও সে আবেশ-মুক্ত নই—অন্তত আমাদেরও বেশির ভাগ সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য।

[দ্বিতীয় খণ্ডে সমাপ্য]

[পরবর্তী (কোনো) সংখ্যায় তাঁর আত্মজৈবনিক ভাবে বিবৃত এবং র‍্যাল্‌ফ লেইটন কর্তৃক লিখিত "Surely you're Joking, Mr. Feynman" গ্রন্থ থেকে আমাদের বিবিধ মন্তব্যের সমর্থনে কিছু-কিছু দৃষ্টান্ত পাঠক-দরবারে উপহার দেবার ইচ্ছে রইলো। —লেখক]

॥ গণবিজ্ঞান ॥

স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অনুসন্ধিৎসা জাগানোর প্রয়াস ॥

উল্লেখযোগ্য এই প্রয়াসটি নিয়েছে চুঁচুড়া সায়েন্স ক্লাব। প্রথমে এই কার্যক্রমটির পর্যালোচনার সাথে পরের লেখাটিতে থাকছে চুঁচুড়া সায়েন্স ক্লাবের পরিচিতি। দুটি প্রতিবেদনই লিখেছেন ক্লাবের জনৈক সদস্য।

চুঁচুড়ায় স্থানীয় স্কুলগুলির উঁচু ক্লাশের ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ বৃত্তি পরীক্ষা' নামে একটি প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে 'চিনসুরা সায়েন্স ক্লাব'। এ বছর এই পরীক্ষার দ্বিতীয় বর্ষ চলছে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পড়ার বইয়ের বাইরে প্রকৃতি ও সমাজ সম্পর্কে কৌতূহল এবং অনুসন্ধানের উদ্যোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই এই পরীক্ষার আয়োজন। এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাত্রছাত্রীদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়। একমাস ধরে খোঁজখবর নিয়ে ; বিভিন্ন বইপত্র পড়ে, অভিভাবক-বন্ধু-শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে নানাভাবে উত্তর সংগ্রহ করে তারা জমা দেয়। উত্তরপত্রে কোথা থেকে কি রকম সাহায্য নিয়েছে তাও তাদের জানাতে হয়। এ বছর থেকে পরীক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে ওয়ার্কশপের। তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় এই ওয়ার্কশপে। দু-বছর এই পরীক্ষা নেওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যাচ্ছে, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ার বই-এর বাইরে নানা বিষয় সম্পর্কে জানতে ও অনুসন্ধান করতে খুবই আগ্রহী। এ জন্যে তারা ঘোরাঘুরি করতে, বড়দের বিরক্ত করতে, পড়ার বইয়ের বাইরে আর পাঁচটা সহজবোধ্য বই পড়তে মোটেও পিছপা নয়। বেশ কিছু শিক্ষকও রয়েছেন যাঁরা এই উদ্যোগে যথেষ্ট সাড়া দিয়েছেন। দু-চারটি স্কুলও এই পরীক্ষা সফল করতে বিশেষ চেষ্টা করছেন। অসুবিধে হল, পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অভিভাবকদের সমর্থন পাচ্ছে না ; সাহায্য তো পাচ্ছে না অনেকেই। 'পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে'—মূলত এটাই অভিযোগ। যদিও, অনুসন্ধান-শক্তি ও যুক্তিবোধ গড়ে উঠলে সেটা পড়াশোনার ক্ষেত্রে এবং সামাজিক

ভাবে আখেরে লাভই হয়। এ প্রসঙ্গে দু-একটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। গত বছর একটি প্রশ্ন ছিল সংক্ষেপে এইরকম—পরীক্ষার্থীদের বলা হয়েছে, দু-জন ধূমপায়ীর কাছ থেকে তাঁরা কতদিন, কি পরিমাণ ধূমপান করেন, তাঁদের বয়স কত, কোন স্থায়ী অসুখ আছে কিনা, ইত্যাদি খবর জেনে লিখতে। এর সঙ্গে মানুষের শ্বাসযন্ত্রের ছবি এঁকে (মাধ্যমিক স্তরে এখন পড়ানো হয়) তার বিবরণী দিয়ে বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় শ্বাসযন্ত্রের কোন কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ছবিতে তা চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে। এছাড়া এই ধূমপায়ীদের ধূমপান বন্ধ করা উচিত কিনা সে সম্পর্কে পরীক্ষার্থীদের মতামত জানতে চাওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য, পরীক্ষার্থীদের সমীক্ষাকৃত বয়স্ক ধূমপায়ীদের অধিকাংশেরই ধূমপান সম্পর্কিত স্থায়ী রোগ রয়েছে দেখা যাচ্ছে এবং বেশীর ভাগ পরীক্ষার্থীই মনে করে স্বাস্থ্যের কারণে এঁদের ধূমপান ত্যাগ করা উচিত। এ প্রসঙ্গে, একটি কথা মনে রাখা দরকার—ধূমপানের আকর্ষণ ও হাতে-খড়ি সাধারণত যে বয়সে শুরু হয়, এই পরীক্ষার ছাত্র পরীক্ষার্থীরা সেই বয়সেই রয়েছে।

গত বছরের এই পরীক্ষার অপর একটি প্রশ্ন ছিল, 'তোমার বাড়ীতে সাধারণভাবে যে সব বিধি-নিষেধ মানা হয় (যেমন হাঁচলে বের হতে নেই, ইত্যাদি), সেরকম দশটির একটি তালিকা তৈরী কর। কোন্ অবস্থায় সেগুলি পালন করতে হয় এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সেগুলি অগ্রাহ্য করার অনুমতি পাওয়া যায়, এগুলির সপক্ষে বাড়ী থেকে কি যুক্তি দেওয়া হয় এবং যুক্তিগুলি বিজ্ঞানসম্মত বলে তোমার মনে হয় কিনা তা ব্যাখ্যা কর।' প্রায় সব পরীক্ষার্থীই এ প্রশ্নটির উত্তর সম্পূর্ণ করেছে। মজার ব্যাপার হল এই, যেসব ক্ষেত্রে এই পরীক্ষার্থীরা নিজেরাই যুক্তি ও ব্যাখ্যা রাখার চেষ্টা করেছে, সেক্ষেত্রে তারা সঠিক উত্তরের কাছাকাছি পৌঁছেছে। কিন্তু যখন তারা অন্যের ওপর নির্ভর করেছে তখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের উত্তর ভ্রান্ত ও প্রমাদপূর্ণ হয়ে গেছে। অভিভাবক ও শিক্ষকমণ্ডলীর একাংশ অবশ্য মনে করেন যে এ ধরনের পরীক্ষা ছাত্রছাত্রীদের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে যা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর। আসলে এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে পরিবেশ-এর ওপর। যদি প্রশ্নগুলি তাদের সিলেবাসের জটিলতম বিষয়, যেমন আলোক সংশ্লেষ-এর আলোক ও অন্ধকার বিক্রিয়া, প্রসঙ্গে করা হত, তাহলেও কিন্তু তারা মানসিক চাপ বোধ করত না। একেবারে আবদ্ধ অবস্থা থেকে উন্মুক্ত চেতনার প্রান্তরে এসে পড়ার ফলে ঠিক চাপ নয়, বরং তাদের মধ্যে এক ধরনের শূন্যতা অনুভূতির সৃষ্টি হচ্ছে। এই শূন্যতার বাস্তব ভিত্তি রয়েছে, কিন্তু এখানে তাদের ছেড়ে দিলে অনুসন্ধান স্পৃহা বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাক, তারা সঙ্কুচিত হয়ে যেতে বাধ্য। এ অবস্থায় মনে হয়, এই পরীক্ষার সাথে সাথে ওয়ার্কশপ ও অন্যান্য উপায়ে আরও বেশী করে তাদের চারপাশের নিত্য দেখা প্রকৃতি, পরিবার, সমাজ সব কিছু নিয়ে গড়ে ওঠা তাদের কৌতূহলের জগতকে চেনা-জানা ও বোঝার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারলে ভাল হয়। বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ পরীক্ষা হবে এই ব্যবস্থাকে কার্যকর করার একটি উপায় মাত্র। □

চুঁচুড়ায় বিজ্ঞান ক্লাবের বারো বছর

সময়টা 1977 সাল। চুঁচুড়ার কয়েকজন উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র দু-একজন স্কুল শিক্ষকের সহযোগিতায় একটা ছোট্ট সংগঠন গড়ে তোলে, নাম দেয় চিনসুরা সায়েন্স ক্লাব। বিজ্ঞানের মডেল তৈরী ও বিজ্ঞান প্রদর্শনী করা, বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে লেখা, বই-পত্র পড়া ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ এবং বিজ্ঞান সেমিনারের আয়োজন করা, এ সবের মধ্যেই তখনকার কাজকর্ম সীমাবদ্ধ ছিল। বিজ্ঞান-চর্চার বিষয়গুলির মধ্যে ছিল, আপেক্ষিকতাবাদ, রমন-এফেক্ট, নিউক্লিক-অ্যাসিডের গঠন ও কাজ ইত্যাদি। এইসব জটিল বিষয়কে ছাত্রছাত্রী ও আগ্রহী মানুষ জনের কাছে সহজবোধ্যরূপে প্রকাশ করাই ছিল সে সময়ের চিনসুরা সায়েন্স ক্লাবের একমাত্র উদ্দেশ্য।

1982-তে, বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠনের সাথে যৌথ উদ্যোগে গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের মাধ্যমে হিরোসিমা দিবসে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যে দিয়ে চিনসুরা সায়েন্স ক্লাব প্রথম গণবিজ্ঞান ভাবনার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। গণবিজ্ঞান বলতে ক্লাবের চিন্তাভাবনা অনুযায়ী মোটা-মুটিভাবে এটাই বোঝা হয়, মানুষের জীবনে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের বিরোধিতা করা, বিজ্ঞানের কল্যাণকর প্রয়োগকে সুনিশ্চিত করা, অ-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও কাজকর্ম পরিহার করা, বিজ্ঞানের প্রতি অধিকার-বোধ গড়ে তোলা, ইত্যাদি। এগুলোও খুব মোটাদাগের কথাবার্তা। তবে আপাতভাবে ক্লাবের ছোট বড় সব কর্মীদের মধ্যে যাতে এই ভাবনাগুলি স্পষ্টভাবে রূপ নেয় তার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চলছে। এজন্যে মাঝে মাঝে বসছে পাঠচক্র, দলবদ্ধ আলোচনা। তবে এসবের থেকেও বেশী কার্যকর পদ্ধতি, যা খুব সচেতনভাবে না হলেও অনুসরণ করা হচ্ছে, তা হল সদস্যদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্তরে নিয়মিত মত ও চিন্তার বিনিময় এবং পারস্পরিক ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ ও পারস্পরিক উৎসাহদান।

গণবিজ্ঞান ভাবনার আগমনের সাথে সাথে কাজকর্মের ধরনেরও পরিবর্তন এসেছে। ঘর-বন্দী সেমিনার চলে এসেছে মাঠে ময়দানে, সামাজিক সমীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে নানা ধরনের, চলছে পাঠ্যসূচী বহির্ভূত বিজ্ঞান চর্চার স্কুল-ভিত্তিক নানা ধরনের প্রকল্প। স্থানীয় শিশু ও কিশোরদের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির সাথেও যৌথ কাজ গড়ে তুলছে এই সংগঠন। ক্লাবের মুখপত্রের প্রবন্ধগুলিতে কিংবা বিজ্ঞান প্রদর্শনীর প্রজেক্টগুলিতে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চার পরিবর্তে শিল্পজ-দূষণ, অপুষ্টি, যুদ্ধাস্ত্র, কুসংস্কার, বনক্ষয় প্রভৃতি মানুষের বিভিন্ন সমস্যা-ভিত্তিক আলোচনার প্রতিফলন হচ্ছে বেশী করে। এইসব কাজ করতে গিয়ে সংগঠন সদস্যরা নানা ধরনের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃসমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এই সব সমস্যার কিছু আছে যা অন্যান্য সংগঠনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, কিছু আবার স্থানীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এলাকাগত সমস্যা ছাড়া কিছু বিশেষ স্থানীয় সুবিধাও রয়েছে। এইসব সুবিধা ও সমস্যাগুলি ভাল করে বোঝার জন্য ক্লাব কর্মীরা যেমন নিজেদের

মধ্যে আলোচনা চালায়, তেমনি অভিভাবকদের নিয়ে সম্মেলন করে, সেই সঙ্গে স্থানীয় স্কুল শিক্ষকদের সাথে জীবন্ত যোগাযোগ রেখে ক্লাব কর্মীরা নিজেদের ত্রুটি বোঝার চেষ্টা করে। ক্লাবের কাজকর্মের এই ধারার পরিবর্তন ক্লাবের সকল সদস্য/সদস্যাই যে ভালভাবে মেনে নিতে পেরেছেন তা নয়। এই ধরনের গণবিজ্ঞানীয় প্রচেষ্টা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে আপত্তি রেখে যেমন সরে গেছেন দু-চারজন সদস্য, তেমনি এ সবের প্রতি আস্থাশীল সদস্য সংখ্যাও বাড়ছে ধীর গতিতে। ফলে ক্লাবের বিকাশ মাঝে মধ্যে স্থিতিশীল হলেও একেবারে ব্যাহত হয়নি কখনও।

পঃ বঙ্গের অন্যান্য বিজ্ঞান সংগঠনের সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, পরিবেশ দিবস, হিরোসিমা দিবস, ভূপাল দিবস ইত্যাদি স্মরণ অনুষ্ঠান, তাদের আয়োজিত বিজ্ঞান প্রদর্শনী, সেমিনার ও বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ছাড়াও চিনসুরা সায়েন্স ক্লাব কেবলমাত্র নিজস্ব উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে যে সব উল্লেখযোগ্য কাজগুলি করছে ও করেছে, তা' হল : (1) চুঁচুড়ার বিভিন্ন বস্তি এলাকায় নিয়মিত শিশু স্বাস্থ্য সমীক্ষা ; (2) স্থানীয় এলাকায় সর্বজনীন দুর্গাপূজোর আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা এবং ঢাকি-ঢুলিদের জীবন সমীক্ষা ; (3) রেয়ন কারখানার দূষণকে কেন্দ্র করে নাটক প্রযোজনা ; (4) বিজ্ঞান কি, কেন, কিভাবে শিরোনামে, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ও বিজ্ঞান মানসিকতার সপক্ষে এবং পরিবেশ দূষণের সামাজিক দিক তুলে ধরে পোস্টার সেট রচনা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা ; (5) গঙ্গা এ্যাকশন প্ল্যানের প্রযুক্তি ও অর্থনীতির সমালোচনামূলক মডেল সহ পোস্টার প্রজেক্ট এবং কমপিউটারের বিবর্তন ও সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণে মডেল সহ পোস্টার প্রজেক্ট ; (6) আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত জিনিসপত্র দিয়ে ছোটদের জন্যে বিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারণা দানের উপযোগী মডেল বানানো ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিয়মিত ক্লাস ; (7) দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ, (8) স্কুলের উচ্চ পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ বৃত্তি পরীক্ষা ; (9) নানা সময়ে স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতর্ক ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, পোস্টার অঙ্কন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আয়োজন করা ; (10) নানা সময়ে বিভিন্ন গণবিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনাসভার আয়োজন করা।

যে কোন বিজ্ঞান ক্লাবের কাজকর্মে প্রধান সমস্যা পাঁচটি : (1) কর্মী (2) দক্ষতা (3) অর্থ (4) তথ্য ও সংবাদ এবং (5) পরিকল্পনা। চিনসুরা সায়েন্স ক্লাব তার সমস্ত কাজকর্ম চালাতে গিয়ে সব থেকে অসুবিধেয় পড়ে প্রথম ক্ষেত্রে। যদিও ক্লাবের বর্তমান কর্মীরা স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে নিরন্তর সদস্য সংগ্রহ ও সদস্যদের কর্মীতে পরিণত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে ক্লাবের জনৈক বয়স্ক সদস্যের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ অর্জন করা যায় নি, ক্লাব আন্তরিকভাবেই তা অনুসরণের চেষ্টা করছে। তাঁর মতে **'strength of a chain is the strength of its weakest member'**—বলবিদ্যার এই নীতিটি যে কোন সংগঠনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

অর্থ এবং দক্ষতার ক্ষেত্রে ক্লাবকে স্থানীয় উৎসের ওপরই নির্ভর করতে হয় এবং যেহেতু খুব জাঁকজমকপূর্ণ কোন অনুষ্ঠান ক্লাব আজ পর্যন্ত কখনও করেনি তাই বিপুল অর্থ ও দারুণ দক্ষতার প্রয়োজন ক্লাবের কখনও হয়নি। বরং সবাই মিলে অর্থ সংগ্রহ এবং সবার মধ্যে দক্ষতা বাড়িয়ে তোলার কাজটাই বেশী করে হয়। তথ্য ও সংবাদের জন্য পত্র-পত্রিকা ও অপরাপর বিভিন্ন সংগঠনের প্রচারপত্র ইত্যাদির ওপর মূলত নির্ভর করতে হয়। স্থানীয় ক্ষেত্রে তথ্য ও সংবাদ সমীক্ষার মাধ্যমেই অর্জন করার চেষ্টা হচ্ছে।

পরিকল্পনার ব্যাপারে ক্লাব মনে করে **'Wisdom lies in collectivity'**—এ কারণে যে কোন পরিকল্পনা গ্রহণে ক্লাবের নেতৃত্ব ও বয়স্ক সদস্যরা সকল সদস্যকেই অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে। তবু উপযুক্ত সংখ্যায় উদ্বুদ্ধ, সচেতন, দায়িত্বশীল ও সক্রিয় কর্মীর অভাবই চিনসুরা সায়েন্স ক্লাবের আজও একমাত্র ও প্রধান সমস্যা। এবং হয়তো এটি তাবৎ বিজ্ঞান ক্লাবেরও প্রধান সমস্যা। **ধ্রুবজ্যোতি দে**

প্রো রে নাটা

লিট্‌ল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণাকেন্দ্র—18 এম, ট্যামার লেন। এই কেন্দ্রের লেখক ব্যাঙ্কে গল্প/প্রবন্ধ জমা রাখা যাবে।

লিট্‌ল ম্যাগাজিন লেখক-কবি ডাইরেক্টরী (1989)-এর জন্য নাম, ঠিকানা, জন্মসাল, লেখার বিষয়, সম্পাদিত প্রত্রিকা ও প্রকাশিত গ্রন্থের বিবরণ পাঠাতে হবে 30.9.88-এর মধ্যে। প্রো রে নাটা, 21 ধর্মদাস কুণ্ডু লেন, শিবপুর, হাওড়া ॥

॥ অর্চনা গুহ লিগ্যাল এইড কমিটির আবেদন ॥

লালবাজার লক-আপে পুলিশ অফিসার রুণু গুহ নিয়োগীর পরিচালনায় অর্চনা গুহর উপর যে শারীরিক নির্যাতন হয়, অর্চনা গুহ তার ফলে পঙ্গু হয়ে যান। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর অর্চনা আদালতের কাছে এই অন্যায়ের প্রতিকার প্রার্থনা করেন।

এটা খুবই দুঃখের বিষয়, গত এগারো বছরেও এই অভিযোগের ন্যায়বিচার হল না। পুলিশ অত্যাচার চালায়, এটা সুবিদিত, কিন্তু কখনই তার জন্য দোষী পুলিশকে শাস্তি পেতে হয় না। অর্চনা গুহ গত এগারো বছর ধরে আদালতে পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছেন। কিন্তু এটা আজ শুধু অর্চনা গুহ বা তাঁর পরিবারের সমস্যা নয়, তাঁর লড়াই, যে কোন গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষেরই লড়াই। তাঁর এই আদালতের লড়াই—এ মামলার ব্যয়ভার অন্তত কিছুটা পরিমাণে বহন করবার জন্য তৈরি হয়েছে অর্চনা গুহ লিগ্যাল এইড কমিটি।

এই কমিটি ইতিমধ্যেই অর্থ সংগ্রহ শুরু করেছে, এবং নাগরিকদের কাছ থেকে অভাবনীয় সাড়াও পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গের ও বাইরের সকল গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিকের কাছে আবেদন, আপনারা এই অর্থ সংগ্রহ তহবিলে নিচের ঠিকানায় মানিঅর্ডার করে টাকা পাঠান।

অর্চনা গুহ লিগ্যাল এইড কমিটি, প্রযত্নে—তিলোত্তমা ভট্টাচার্য, 18 মদন বড়াল লেন, কলকাতা 700012

সাপে কাটলে কি করবো : একটি বিতর্ক ॥

সুদীপ্ত সরস্বতী

ওঝা গুণিনদের আমরা খুব সহজেই সমালোচনা করে থাকি। অথচ "বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাপদ্ধতি"র নামী-দামী বইগুলো দেখলেই বোঝা যায়, সাপে কাটার ব্যাপারে একদম মৌলিক প্রশ্নগুলিতে "বিজ্ঞান" কত দিশাহারা। এই প্রশ্নগুলির সুনির্দিষ্ট উত্তর কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে খুব জরুরী।

গণবিজ্ঞান আন্দোলনের ভাবনা মাথায় রেখে যেসব বাংলা পত্রপত্রিকা বেরোতে থাকে, তাদের মধ্যে কলকাতা থেকে প্রকাশিত "উৎস মানুষ" পত্রিকায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবনীভূষণ ঘোষ ও অমিয়কুমার হাটি 1980-81-তে তাঁদের লেখায় সাপ সম্পর্কে জনগণের একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ'ড়ে তোলার চেষ্টা করেন। 1981-তে সেই লেখাগুলোর একটা সংকলন প্রকাশিত হয় "সাপ নিয়ে কিংবদন্তী" নামে। কলকাতার বাইরে থেকে প্রকাশিত "লোকবিজ্ঞান" পত্রিকার এপ্রিল-জুন '83 সংখ্যা একই উদ্দেশ্যে "বিশেষ সর্পসংখ্যা" হিসেবে বেরোয়। এসব অভিনন্দনীয় প্রচেষ্টা থেকে আমরা জেনেছিলাম, "শহরে নগরে গ্রামে গঞ্জে সর্পাঘাত চিকিৎসায় ওঝা গুণিন-বাবাদের যা কিছু অলৌকিক কৃতিত্ব, অতিপ্রাকৃত শক্তি বা আধিদৈবিক ক্ষমতা বলে প্রচারিত তার আসল রহস্য লুকিয়ে আছে দুটো বিশেস জায়গায়।" এক, "পৃথিবীতে নির্বিষ ধরনের সাপের সংখ্যাই বেশি এবং সাপে কামড়ানোর ঘটনার তিনভাগের দু'ভাগই নির্বিষ সাপ থেকেই হয়।" দুই, "বিষাক্ত সাপে কামড়ালেও 50 শতাংশের ক্ষেত্রে কোনো বিষক্রিয়াই হয় না। পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি দশটা কেউটে-কামড়ানো রোগীর মধ্যে মারা যাবার সম্ভাবনা মাত্র একজনের। এর কতকগুলো কারণ আছে। জাতসাপ কামড়েছে অথচ বিষ ঢালতে পারে নি, এমন প্রায়ই হয়। সাপ দিনের আলোতেও ঠিকমতো দেখতে পায় না, দূরত্ব বুঝতে পারে না। 6 ফুট লম্বা কেউটেও বড়জোর দু'ফুট দূরের মানুষকে কামড়াতে পারে। মানুষ কামড়ানোর আগে হয়ত অন্য কোনো জন্তুর ওপর বিষ ঢেলেছে, সেক্ষেত্রে মানুষের ওপর সে বিষ কম ঢালে।" "সেই সুযোগটা নেয় ওঝা। বিষক্রিয়ার মিথ্যা ভয় ধরায়, তারপর নানা তুকতাকে আপাত-অসুস্থ রোগীর মনোবল ফিরিয়ে এনে চাঙা করে তোলে।"

কাজেই, বিষধর সাপে কাটা রোগীর নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা ওঝার মন্ত্র নয়, অ্যান্টিভেনম সেরাম ইঞ্জেকশন। কিন্তু সে তো হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। অথচ সাপে কাটার বেশিরভাগ ঘটনাই ঘটে গ্রামেগঞ্জে, যেখান থেকে হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌছতে অন্তত ঘণ্টাখানেক সময় লাগে। **বিষধর সাপের দংশন এবং হাসপাতালে পৌঁছনোর মধ্যের সময়টা রোগী জনগণের তত্ত্বাবধানে থাকে। এসময় জনগণের কোন্ ভুমিকা পালন করা বিজ্ঞান-সম্মত, তা জনগণেরই জানা দরকার।** জনগণের একজন হিসেবে যেটা জানতে গিয়ে বেশ কিছু "বৈজ্ঞানিক" বই-পত্র পত্রিকার পাতা উলটে বিভ্রান্ত হলাম।

সাপে কাটার প্রধান প্রাথমিক লোকচিকিৎসা বাঁধন দেওয়া। এ সম্পর্কে "মানুষ" ("উৎস মানুষ" পত্রিকার আগের নাম) পত্রিকার জুন, 1980 সংখ্যায় কলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের মেডিক্যাল এন্টোমোলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ অমিয়কুমার হাটি লিখেছেন, বাঁধন দেওয়ার "কতকগুলো বিপদ আছে—**খুব শক্ত করে তাগা বাঁধলে গ্যাংগ্রিন হয়,** অংশটা পচে যায়। বিষ, বিশেষত কেউটে গোখরোর বিষ (এবং সমুদ্র সাপের বিষ), খুব তাড়াতাড়ি রক্তে মেশে। যত শক্ত বাঁধনই হোক না কেন, বিষকে আটকানো যায় না বরং উল্টো ফলই হয়—শক্ত বাঁধনের জন্য দেহকোষে অক্সিজেন সরবরাহ কমে, তার ফলে বিষ রক্তে বেশী মেশার সুযোগ পায়। বাঁধন দিলেও, যখন অ্যান্টিভেনিন ইঞ্জেকশন দিতে শুরু করা হয় তখন বাঁধন অবশ্যই খুলে দিতে হবে। যখন স্পষ্টই বোঝা যায় নির্বিষ সাপে কামড়েছে, তখন বাঁধন দেওয়া অর্থহীন।

"বাঁধন তবু দিতে হবে, কারণ এর একটা মনস্তাত্ত্বিক দিক রয়েছে। বাঁধন দিলে সাপে কামড়ানো রোগী মনে করে তার জন্য কিছু করা হচ্ছে। এটাই তার মানসিক শক্তি যোগায়—একথাটা আগেই বলেছি, মনের জোর পেলে রোগী বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে বেশি।"

ঐ পত্রিকার সেপ্টেম্বর '80 সংখ্যায় প্রকাশিত এক চিঠিতে প্রবীণ সর্পবিদ অবনীভূষণ ঘোষ লেখেন,..."যথাসময়ে ঠিকমতো বাঁধন দিতে পারলেও কোনোই উপকার হয় না—একথা মেনে নিতে পারলাম না।" এর উত্তরের উপসংহারে ডাঃ হাটি জানান, "বাঁধন দিয়ে রোগীর মনের বল ও ভরসা ফিরিয়ে আনা তো খুব বড় উপকার! তবে সেই বজ্রআঁটুনি তাগার জন্য যদি গ্যাংগ্রিন বা অন্য কোনো বাড়তি বিপদ এসে যায় তাহলে তো সেটা পরিহার্য বটেই।"

"লোকবিজ্ঞান" পত্রিকার 'বিশেষ সর্পসংখ্যা'য় ডাঃ শান্তিগোপাল সাহা বাঁধন দেওয়ার প্রসঙ্গটাই এড়িয়ে গেছেন...

লাতিন আমেরিকার জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের পথিকৃৎ কর্মী ডেভিড ওয়ার্নারের বিখ্যাত বই "Where There is No Doctor"-এর বাংলা অনুবাদ (অনুবাদক : কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক : ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন, 1986) "যেখানে ডাক্তার নেই"-তে লেখা হয়েছে : (সাপের) "কামড়ের একটু ওপরে হাত বা পায়ের চারদিকে কাপড় দিয়ে বাঁধন দিন। খুব বেশি শক্ত করে বাঁধবেন না, আর আধ ঘণ্টা পর এক মিনিটের জন্যে আলগা করে দেবেন।"

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট প্রকাশিত হফকিন ইন্‌স্টিট্যুটের (বোম্বে) ডঃ পি. জে. দেওরাজের (Deoras) বিখ্যাত "Snakes of India" (1981-র মুদ্রণ) বইয়ে বাঁধন দেবার পরামর্শ দিয়ে বলা হয়েছে, "This would prevent the venom from being absorbed into the upper part of the limb।" অবশ্য স্বীকার করা হয়েছে, নিউরোটক্সিক (neurotoxic) বিষের ক্ষেত্রে এই প্রাথমিক চিকিৎসা পুরোপুরি কার্যকরী নাও হতে পারে (may not be fully useful)।

মস্কোর মিয়্যার (Mir) পাবলিশার্স প্রকাশিত (1985-র) প্রকাশনা "First Aid" বইয়ে ভি. এম. বাইয়ানোভ (Buyanov) লিখেছেন, "A haemostatic tourniquet or a twist should be applied immediately, within two minutes of the bite, considerably higher than the site of the bite." (p. 179)।

অথচ ঐ একই প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত (1986-র মুদ্রণ) "Accident First Aid" পুস্তিকায় [লেখক ভি. ভি. ইউদেনিচ (Yudenich)] বাঁধন দেবো কি দেবো না, সে সম্পর্কে কোনো উচ্চবাচ্যই নেই।

"Harrison's Principles of Internal Medicine" [প্রকাশক: McGraw-Hill Book Company, 11th edition, 1987] বইয়ে লেখা রয়েছে, "If anatomically feasible, a wide constriction band should be placed a few cm. above the bite and made tight enough to allow one finger to pass beneath with difficulty." (p. 832)। বলা হয়েছে, এর উদ্দেশ্য লিম্‌ফ্‌ প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করা (to impede lymph flow)।

"Davidson's Principles and Practice of Medicine [প্রকাশক : ELBS/Churchill Livingstone, 14 edition, 1984] বইয়ে লেখা আছে, "Arterial tourniquets are no longer indicated.....Firm pressure bandaging of the bite area and immobilisation of the part substantially delays spread of venom" (p. 710)।

ডেভিডসনের বইটির সাম্প্রতিকতম সংস্করণে [15 edition 1987] "firm pressure bandaging" সম্পর্কে একই কথা বলা আছে অথচ "arterial tourniquets"-এর কোনো উল্লেখই নেই। (p. 710)

"Cecil Textbook of Medicine"[প্রকাশক : Igaku Shion/ Saunders International, 17 edition, 1985] বইতে বলা হয়েছে "If a constricting band (not a tourniquet) is used, it should be immediately proximal to the wound···If incision and suction is not to be used, the Australian Serum Institute recommends application of a broad firm constrictive bandage immediately over the bite, then bandaging of as much limb as is possible." (p.1842)।

"Oxford Textbook of Medicine" [ELBS edition 1985] বইতে লেখা হয়েছে, "The value of tourniquets has not been adequately investigated in human patients. A broad, firm but not tight, constricting band may temporarily delay the spread of viper venoms along lymphatics, but this is not necessary unless the journey to hospital is likely to take more than about 30 minutes. A light (arterial) tourniquet is effective in preventing venous return from the occluded limb and delays death in animals given some elapid and viper venoms. Such tourniquets are potentially very dangerous, and have been responsible for gangrenous limbs. Their use is only justified in the case of bites by dangerously neurotoxic elapids, snakes, and Australian snakes, when the delay in reaching medical care is likely to be more than 30 minutes but less than two hours. In these particular circumsttances the tourniquet may delay the development of respiratory paralysis or cardiovascular collapse until some medical help is available. The arterial tourniquet must be released for 15 seconds every 30 minutes and shuld, on no account be applied for more than two hours. Recent studies in restrained monkeys have shown that crepe bandaging and splinting of the injected limb is effective in delaying the spread of snake and spider venoms." (p. 6-40)।

"Forensic Medicine and Toxicology" Vol. II [প্রকাশক : Academic Publishers (Calcutta/New Delhi) 1985] বইতে বিখ্যাত ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ডাঃ জে. বি. মুখার্জি লিখেছেন, "A ligature or tourniquet with a thick India rubber band, a broad strip of cord or any ligature available on the spot should be applied at once approximately 5 cms above the site of bite,.....It should be tight enough to occlude lymph channels and superficial veins of the part bitten." (p. 888)।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (IMA) প্রকাশিত "Journal of the IMA" Vol. 85, No. 5, May 1987-এর সম্পাদকীয়তে কলকাতার ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিনের অ্যাসোসিয়েট প্রোফেসর ডাঃ সুজিত মিত্র লিখেছেন, "If admission to hospital or administration of antivenom serum (AVS) is delayed

over 30 minutes, an absorption-delaying tourniquet preferably compressive bandage with crepe should be applied firmly as for a sprain over the bite site and above covering the whole limb. The bandage should not be released during transit." (p. 131) ।

আমার প্রশ্ন, **মানুষের শরীরে** বাঁধনের কোনো শরীরবৃত্তীয় উপযোগিতা (যেমন, বিষ ছড়িয়ে পড়াকে বিলম্বিত করা) নেই—এমন কথা কি **সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে ?** যদি তা না হয়ে থাকে, তবে…

এক ॥ "বাঁধন শুধুমাত্র মানসিক স্বস্তিই আনে" এরকম ধারণা বিজ্ঞানের মোড়কে প্রচারের কোনো অধিকার আমাদের আছে কি ?

দুই ॥ এরকম "কুসংস্কারবিরোধী" "বৈজ্ঞানিক" প্রচারে প্রভাবিত হয়ে কোনো "বিজ্ঞানমনস্ক" সাপে কাটা রোগী যদি বাঁধন না দেন অথচ বিষ মেশাকে ঠেকিয়ে রাখতে বাঁধনের কার্যকরী ভূমিকা যদি বাস্তবে থেকে থাকে, তাহলে রোগীটির মৃত্যুর জন্যে আমরা দায়ী থাকব ? **এটা ধ'রে নিতে হবে,** অন্তত ঘণ্টানেকের আগে রোগী অ্যান্টিভেনম সেরাম ইঞ্জেকশনের কাছে পৌঁছতে পারছেন না।

পুনশ্চ : **বাঁধন দেওয়ার ফলে** সাপে কাটা রোগীর **গ্যাংগ্রিন হওয়ার ঘটনার ব্যাপকতা কতটা ?**

এবারে কাটাচেরার প্রসঙ্গ

ডাঃ হাটি : "কামড়ানো জায়গাটা অনেকেই কাটা-চেরা করেন। এতে সব বিষ বেরিয়ে আসবে—এমন একটা ধারণা। এটার পিছনে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই ; বরং বিপদ বাড়ার আশঙ্কা আছে। ক্ষতস্থান যত আঘাত পাবে, ততই বিষ রক্তে মিশবে বেশি। যাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলে টিস্যু ড্যামেজ, যেটা বাড়লে বিষ সেই পরিমাণে তাড়াতাড়ি মিশবে।

"কেটে বা চিরে দেওয়ার পিছনে যে উদ্দেশ্যটা কাজ করে সেটা বড়ই অযৌক্তিক। ভালমত কামড়ালে সাপ বেশ গভীরেই বিষ ঢালে, তখন কতটাই বা চেরা যায় ! বরং ছোট জায়গায় কোষ পচে যেতে, উপরন্তু টিটেনাস ইত্যাদি জীবাণু আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় এলোপাথাড়ি অনেকগুলো কাটা-ছেঁড়া করা হয়, এটা আরও বিপজ্জনক। এই পশ্চিমবঙ্গেই একটা ঘটনার কথা জানি : এরকম চিরে দেওয়ার পর ক্ষতস্থান দূষিত হ'ল, রোগ সংক্রমণ হয়ে ছড়িয়ে গেল। কনুই অবধি কেটে বাদ দিতে হল ডান হাতটা। অথচ কামড়েছিল নির্বিষ সাপেই —এমনিতেই সে বেঁচে যেত, মাঝখান থেকে হাতটা গেল।

…"ক্ষত মুখে দিয়ে বিষ টেনে নেওয়ার একটা পদ্ধতি আছে। এতে খুব সামান্যই বিষ বের হতে পারে, বরং অপরদিকে সাহায্যকারীরই বিপদের সম্ভাবনা থাকে। মুখে ঘা থাকলে বা দাঁতের মাড়িতে রক্ত পড়লে বিষ তাতে মিশে গিয়ে যে শুষছে তারই প্রাণসংশয় এনে দিতে পারে। ক্ষতস্থান থেকে বিষ টেনে আনার পাম্প উদ্ভাবনের চেষ্টা হয়েছে বিভিন্ন দেশে, সুফল মেলেনি।"

ডাঃ সাহা : দংশিত স্থান "ব্লেড দিয়ে কাটা…চলবে না।"

ডেভিড ওয়ার্নার : "খুব পরিষ্কার ছুরি দিয়ে (আগুনের শিখায় জীবাণুমুক্ত করে নিয়ে) প্রত্যেক বিষদাঁতের দাগের মধ্যে কেটে দিন : প্রায় 1 সেঃ মিঃ লম্বা আর $\frac{1}{2}$ সেঃ মিঃ গভীর করে। [কিভাবে কাটতে হবে বইটিতে তার একটা ছবিও দেয়া আছে।—সু. স.]

"তারপর, যদি আপনার মুখে বা দাঁতে ঘা না থাকে, তাহলে 15 মিনিট ধরে বিষটা শুষে নিন আর থুথু ফেলে বার করে দিন।

"দ্রষ্টব্য : কামড়ানোর পরে আধঘণ্টার বেশি সময় কেটে গেলে কামড়ের জায়গা কেটে দেবেন না বা শুষবেন না। তাতে উপকারের থেকে ক্ষতিই বেশি হতে পারে।"

দেওরাজ বাঁধন দিয়ে "বিষ মেশাকে বিলম্বিত করার পর" (after retarding the absorption) বিষদাঁতের ক্ষতদুটোকে নির্দিষ্ট উপায়ে নির্দিষ্ট সতর্কতা অবলম্বন ক'রে চিরে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। সেই চেরা জায়গা দিয়ে সাকশন পাম্পের সাহায্যে রক্ত ও লিম্ফ্ চুষে নিতেও তিনি বলেছেন।

বাইয়ানোভ আগুনে গরম ক'রে জীবাণুমুক্ত করা (sterilized) ছুরি দিয়ে সাপে কামড়ানো জায়গাটা চিরে দেয়ার পর মেডিক্যাল কাপ, ব্রেস্ট পাম্প বা রবার বাল্ব দিয়ে বিষমেশা রক্ত টেনে নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

ইউদেনিচ লিখেছেন, (সাপে কামড়ানোর) "First aid consists in rapid, vigorous sucking out of the contents of the wound for 15 minutes. Such sucking of the wound by mouth for the first six minutes after a bite, it should be noted, ensures that about three-quarters of the venom is sucked out……The venom getting in the succer's mouth is rapidly dissolved and rendered harmless, and the amount of venom becreted by the guake is not dangerous even when the helper has scratces on the lips and lining of the mouth." (p. 40-41)

Harrison-এর বইটিতে বলা হয়েছে, কামড়ানোর 15 মিনিটের মধ্যে যদি রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে বিষদাঁতের প্রতিটি ক্ষত চিরে দিয়ে সেই চেরা জায়গা থেকে রবার বাল্ব, ব্রেস্ট পাম্প বা অক্ষত মুখ দিয়ে ক্রমাগত রক্ত চুষে ফেলতে হবে যতক্ষণ অ্যান্টিভেনম দেওয়া না হচ্ছে। ওতে লেখা রয়েছে, **"Incision and suction are extremely important and should be diligently carried out.** When begun promptly, they may result in the removal of up to 50% of subcutaneous injected venom." (p. 832) ।

[বাকি অংশ তৃতীয় প্রচ্ছদে দেখুন]

যদি 'ক্রমশই বিভ্রান্ত লাগে'.....

পাঠক-প্রতিক্রিয়া সাধারণভাবে জানাই যায় না। সৌমেনবাবু 'এক নিঃশ্বাসে' পড়ে ফেলে তাঁর লিখিত মন্তব্য জানিয়েছেন—সেইজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। শুরুতে সৌমেনবাবু তাঁর নিজস্ব ঝাঁঝালো ভংগীতে 'বি-ও-বি'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত "খানদানী বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের প্রসঙ্গে—অতিরঞ্জন, উচ্ছ্বাস আর তথ্যভ্রান্তি"র গুরুতর অভিযোগ এনেছেন; আবার সবশেষে ভেজা বারুদের মত লিখেছেন—"ওপরের সবটুকু নিজের বিভ্রান্ত অবস্থাজনিত। ভুলভাল ধরার জন্য নয়।" তাহলে আর লেখা কেন সৌমেনবাবু, বিশেষত বিভ্রান্তির ঘোরে? মনে হয় এ স্ববিরোধিতার জন্য আপনি নিজেই সঙ্কুচিত হবেন বেশি। তাই এ নিয়ে আর কথা নয়। পরের কথাটি হল এই যে প্রথম দুটি অভিযোগ আমাদের 'অতিরঞ্জন ও উচ্ছ্বাস' প্রকাশের সমর্থনে—আপনি একটি বাক্যও ব্যয় করেন নি। কেন—অথেয়ালে না নেই ব'লে? অথচ এ দুটিই একটি বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকার পক্ষে খুবই ক্ষতিকর ও বেমানান। এবারে ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি প্রসঙ্গে আপনার ছ'টি পয়েন্টের জবাব সীমিত সাধ্যের মধ্যেই দেবার চেষ্টা করছি—ভুলটুল থাকলে সুনির্দিষ্টভাবে আবার ধরিয়ে দেবেন, এই আশা:

(1) ঠিকই; আপনার উল্লেখিত প্রথম বিষয়টিতে আমাদের বলতে চাওয়া ও বলার মধ্যে উপস্থাপনা-দোষে ত্রুটি রয়ে গেছে। কিন্তু সামগ্রিক প্রেক্ষিতটি ভাবলে অতটা বিভ্রান্ত হবার কথা নয়—যতটা আপনি হয়েছেন, বলছেন! তবুও ত্রুটি ধরিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনাকে এবং বলছি যে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আরো সতর্ক হবার চেষ্টা থাকবে আমার ও আমাদের।

কিন্তু, আপনার লেখায় অমন 'জানি—কিন্তু বলবোনা' গোছের ভাব কেন তা বুঝলাম না। যা বলবার অকপটে বলুন, প্লীজ।

(2) আমাদের আলোচনার ভিত্তিবর্ষ ছিল মূলত 1987—শতবর্ষপূর্ব সে বছরটি হ'ল 1887—1888 নয়। পত্রিকা প্রকাশে অনেক দেরি হওয়ায় 1988 এসে গিয়েছিল এবং তখন সি. ভি. রমন [ভারতীয় এক-মাত্র নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী হিসেবে—আবার সেই অচ্ছুৎ (!) শব্দটি ব্যবহার ক'রে ফেললাম!]-এর নামে দু'টি লাইন জুড়ে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু হার্টজ্ নিউটনীয় বলবিদ্যাকে 'সংশোধন' করেছিলেন—ঠিক শব্দ ব্যবহার করলেন তো? বিস্তারিত রেফারেন্স সহ যদি দয়া ক'রে বিশদভাবে জানান খুবই ভালো হবে আমাদের বোঝা ও জানার পক্ষে। আর, পরীক্ষামূলকভাবে একটি তত্ত্বীয়-কাঠামোর ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া তথা দেখানো বা জানানোই যে সংশোধন করা নয়, সে তো আপনি নিশ্চয়ই জানেন।

(3) মাইকেলসন ও মোরলির প্রতি আইনস্টাইন কতটা অবিচার করেছেন, কেন করেছেন এসব জিজ্ঞাসা বা মন্তব্যের জবাব স্পষ্টতই আমরা দিতে পারি না। আমরা শুধু ওঁদের দু'জনের কাজের গুরুত্বটা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম—করেছিও। ঠিক ভুলের কথা এক্ষেত্রে বাদ দিন—ঘুরিয়ে বললে আপনি খুশি হবেন?—যেমন ধরুন, মাইকেলসন-মোরলির এক অসাধারণ পরীক্ষাগত পর্যবেক্ষণের একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা জুটেছিল আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্বে, চলবে এতে? চললে ভালো—আমাদের আপত্তি নেই।

(4) 'বিজ্ঞানীদের জন্মশতবার্ষিকী' পালন ব্যাপারটাকে আপনি ধিক্কার দিতে চান—বেশ তো—একবার কেন, সহস্রবার দিন—সে তো আপনার মৌলিক অধিকার! অপরদিকে, আমরাও আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করবো—তা ব্যক্তিগতভাবে আপনার মনঃপুত হোক আর নাইহোক। কিন্তু আপনি শুধু বিজ্ঞানীদের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনকে ধিক্কার জানালে অবস্থানটা খুব অসংগতিপূর্ণ হয়ে যাবে না? ভেবে দেখবেন। নাকি এসব লেখার ফাঁক-ফোঁকর—যেমন আমাদের হয়েছিল আর-কি!

শেষে বলি, 'জন্মসূত্রে কেউ বিজ্ঞানী হয় না' (আপনারই উক্তি) এটা যতটা ঠিক ততটাই বোধ হয় খাঁটি একটা কথা, সৌমেনবাবু, যে পাথর ভেঙ্গে কোনদিনই পাখির ছানা বেরিয়ে আসে না!

(5) নোবেল পুরস্কার পাওয়াটা একটা ঘটনা—সম্মানজনক ব'লেই স্বীকৃত ও চিহ্নিত। তবে বিজ্ঞানী হিসেবে বড়ত্বের বা মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের এটা কোন চূড়ান্ত অভিজ্ঞান নিশ্চয়ই নয়। তাই ব'লে নোবেল-প্রাপককে 'নোবেল'জয়ী বলা যাবে না, এটা আবার কোন্ আবদার! একমাত্র নোবেল-জয়ীরাই বলতে পারেন এবং বললে মানায় যে "ওটা কিছু নয়।" আমি-আপনি একথা বললে লোকে হাসবে! তবে হ্যাঁ, একশ্রেণীর মানুষ ও বিশেষত সাহিত্যিক এবং বিজ্ঞানীদের মধ্যে 'নোবেল'-এর জন্য যে হ্যাংলামি আছে এবং নোবেল কমিটিতে ও তার বাইরে জাতি-বর্ণ-রাজনীতির যে কুৎসিত খেয়োখেয়ি বা ঘোলাজলের আবর্ত রয়েছে, তা অবশ্যই নিন্দার্হ।

ডঃ কে. এস. কৃষ্ণানের নামোল্লেখ? লাভ কি? স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির ভাগাভাগি প্রশ্নে বিজ্ঞানে এরকম তো হাজার হাজার ট্রাজেডি আছে। আর সে সব ভেবেই তো আমরা শেষ প্যারায় কয়েকটি অর্থবহ লাইন যোগ করেছিলাম—আপনি সেটা না দেখে বা না বুঝে সেখানে কোথায় প্রগতিশীল 'প্রতিশ্রুতি' আবিষ্কার ক'রে বসলেন, বুঝলাম না। যা ছিল সেটা শুধু নিজেদেরই সতর্ক ক'রে দেওয়ার উদ্দেশ্যে—তাকে তো প্রতিশ্রুতি বলে না—বলে সতর্কীকরণ! তাহ'লে কি শব্দ ব্যবহারে আপনার ক্রমাগত

শৈথিল্য ঘটে যাচ্ছে? তাছাড়া একথাটাও আপনি নিশ্চয় বুঝবেন যে সম্পাদকীয়তে বরাদ্দ এক/দেড় পৃষ্ঠার মধ্যে আমরা বিজ্ঞানের সংশোধিত ইতিহাস লেখার চেষ্টা করতে পারি না।

(6) 'ওয়েভ মেকানিক্স' সামগ্রিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বাইরের জিনিস নয়—একেবারে তার পরিবারভুক্ত সদস্য। আজকাল 'নতুন' 'পুরোনো' এরকম কোনো বিভাজন চালু নেই। এখনকার বিভাজনের ভিত্তি সম্পূর্ণ আলাদা। এ ব্যাপারে যা লেখা হ'য়েছিল তা পুরোপুরি ঠিক। এ নিয়ে খামোখা আপনি কথা তুলেছেন—যদিও আপনারই ভাষায় 'বড়ো দ্বিধায়'! মনে এত দ্বিধা নিয়ে বিজ্ঞানের বিষয়ে কারুরই কিছু লেখা, বোধহয়, অযথার্থ কাজ। নিজের খটকা লাগলো আর সঙ্গে সঙ্গে হাতে কলম তুলে নিলাম—এটা করা ঠিক নয়।

এর পরেও এসব নিয়ে বা ভবিষ্যতের কোন বিষয়ে যদি ক্রমশঃই বিভ্রান্ত লাগে তবে 'এক নিঃশাসে' পড়া বন্ধ ক'রে আগে বিশ্রাম নিয়ে, পরে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে পড়ুন, এই বিনীত অনুরোধ—'এক নিঃশ্বাসে' পড়ে ফেলাটা আপনার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই রোগের উৎস হ'তে পারে—কারণ তাতে মাথা কাজ করবার সুযোগ পায় না; চিন্তার দরজা বন্ধ হ'য়ে যায়।

20 July, 1988

সুব্রত ভট্টাচার্য

ফুকুয়োকার কিছু বক্তব্যে সন্দেহের ছায়াপাত

"বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী", মে-জুন 1988 সংখ্যার প্রচ্ছদ-নিবন্ধ "মাসানোবু ফুকুয়োকা" (লেখক: মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার) প্রসঙ্গে এই চিঠি লেখা।

আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিপ্রযুক্তি বা শিল্পীয় কৃষির (industrial agriculture) ব্যবহার বাড়ার সাথে সাথে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট, জমির উর্বরতা নাশ, পরিবেশ দূষণ, শরীরবৃত্তে কীটনাশক বা পেষ্টিসাইডের ছোবল এসব দিন দিন বেশি বেশি ক'রে সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে। তাই ইকোলজিভিত্তিক বিকল্প কৃষিপ্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তাও প্রকট হচ্ছে। মাসানোবু ফুকুয়োকার জীবন এই বিকল্প খোঁজার এক আন্তরিক প্রচেষ্টা।

ফুকুয়োকার কাজকর্ম ও স্পিরিটের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখেও কিন্তু তাঁর কিছু যুক্তি আমার কাছে দুর্বল বা সন্দেহজনক মনে হয়েছে। যেমন, ফুকুয়োকার মতে, "Industrial Agriculture, Animal Husbandry ও Poultry"-র ফলে উৎপন্ন "ধান, গম, মাংস, ডিম, দুধ" এসব খাদ্য (foods) গ্রহণের ফলে "মনুষ্যদেহ কিছু মূল্যবান ভেষজ ও পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়।"

আমার প্রথম প্রশ্ন: Industrial Agriculture-জাত ধান, গম এসব খাবারে সনাতন পদ্ধতিতে উৎপন্ন ধান, গমের তুলনায় পুষ্টিদ্রব্য (nutrients) কম থাকে—একথা কি প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্য? কম থাকলে কতটা কম থাকে? দ্বিতীয় প্রশ্ন: ধান, গম, মাংস, ডিম, দুধ এসব খাওয়ার মাধ্যমে কোন্ কোন্ "মূল্যবান ভেষজ" আমাদের শরীরে ঢোকে এবং তাতে শরীরের কী লাভ বা ক্ষতি হয়?

এখানে খেয়াল রাখা দরকার, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ (minerals) এসব কিছু কিছু রোগের (যেমন অপুষ্টি) চিকিৎসায় ওষুধের কাজ করলেও এদেরকে সাধারণভাবে পুষ্টিদ্রব্যের কোঠাতেই ফেলা হয়। ভেষজ বলতে সাধারণত ওষধিগুণসম্পন্ন (pharmacologically active) সেইসব পদার্থকেই বোঝায় যারা শরীরের অসুস্থ অবস্থাকে (pathological condition) সুস্থ অবস্থার (physiological condition) দিকে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। তাই সাধারণভাবে পুষ্টিদ্রব্যকে ভেষজ বলাটা ঠিক নয়—অন্তত যেখানে "মূল্যবান ভেষজ ও পুষ্টি" বলা হচ্ছে, সেখানে তো নয়ই।

যাই হোক, মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের লেখায় এ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে, "যেমন পোলট্রির মুরগীর ডিমের কুসুম অপেক্ষাকৃত জোলো, সাদাটে ও স্বাদহীন; কিন্তু প্রকৃতির কোলে তার নিয়মে বেড়ে ওঠা মুরগীর ডিমের কুসুম সুস্বাদু, অপেক্ষাকৃত শক্ত ও সুন্দর কমলা রঙের।"

এই উদাহরণের ব্যাপারে বলা যায়, ডিম খাওয়ার মাধ্যমে আমাদের শরীর কোনো "মূল্যবান ভেষজ" পায় বলে আজ অবধি প্রমাণিত হয়নি। আর পোলট্রির মুরগীর ডিম ও "প্রকৃতির কোলে তার নিয়মে বেড়ে ওঠা মুরগীর ডিমে"র পুষ্টিমূল্যের কোনো গুরুত্বপূর্ণ (significant) তফাৎ পুষ্টিবিজ্ঞানীদের গবেষণায় আজও ধরা পড়েনি। আসলে চ'রে খাওয়া মুরগীরা তাদের চারপাশের খাবার থেকে প্রচুর বিটা ক্যারোটিন পায় যা তারা ডিমেও চালান ক'রে দেয়। বিটা ক্যারোটিনের কমলা-হলুদ রঙটাই আমাদের দেখতে ভালো লাগে। বিটা ক্যারোটিন খেলে আমাদের শরীরে তা থেকে ভিটামিন এ তৈরি হয়। বিটা ক্যারোটিন ছাড়া 'রেডিমেড' ভিটামিন এ-ও অবশ্য দেশী ডিমে থাকে। কিন্তু পোলট্রির খাবারে বিটা ক্যারোটিন কম থাকায় ডিমেও তা যায় সামান্য। ফলে পোলট্রির ডিমের রঙ হয় ফ্যাকাশে ফিকে হলুদ। তবে এতে যথেষ্ট ভিটামিন এ থাকে। তাই বিটা ক্যারোটিনের ঘাটতিটা পুষিয়ে যায়। পোলট্রির ডিম অনেকের কাছেই "বিস্বাদ" বা "স্বাদহীন" লাগার কারণ রয়েছে মুরগীর খাবারে। যেমন, মুরগীর বরাদ্দ খাবারে একটু বেশি মাছজাত অংশ (fishmeal) থাকলে ডিমে আঁশটে গন্ধ হয়। কিন্তু এই আঁশটে গন্ধের রাসায়নিক পদার্থ শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক—এমন কথা প্রমাণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আপনাদের কারও জানা আছে?

সুদীপ্ত সরস্বতী

31শে জুলাই 1988

বিজ্ঞান কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সাপে কাটলে কি করবো : একটি বিতর্ক
(বাকি অংশ)

Davidson-এর বইটির 14 সংস্করণে (1984) লেখা আছে,··· incision excision of the bite area should not be done." (p. 710)। কিন্তু ঐ বইয়েরই 15 সংস্করণে (1987) "incision excision"-এর কোনো উল্লেখই নেই।

"Cecil Textbook of Medicine" বইটিতে লেখা রয়েছে, "The value of incision and suction (I & S) has been questioned. It has been stated that if I & S is begun within three minutes after subcutaneous envenumation, 22 to 50% of injected venom can be removed. Recovery is much less after intramascular envenomation and if I & S is delayed. As a practical matter, if the patient cannot reach definitive care (antivenin) with one and one-half hours, prompt I & S is appropriate. If more than 15 minutes have elapsed since a bite, I & S should not be performed. Mouth suction should be used only if no other method is available. In the absence of oral lesions, mouth suction poses no risk to the first aider because ingestion of venom is harmless ; however mouth suction does result in the equivalent of a human bite to the victim·····Linear incisions, 1 cm long and no deeper than 3mm, should be made over each fang mark." (p. 1842)।

"Oxford Textbook of Medicine" বইটিতে লেখা আছে, "All traditional 'boy scout' remedies should be avoided. Local incisions and suction are more likely to introduce infection and give rise to persistent bleeding than to remove significant amounts of venom from the wound. (p. 6-40)।

ডাঃ জে. বি. মুখার্জি লিখেছেন, "Suction will remove 20% of poison if it is done within a few minutes of bite." (p. 889)।

ডাঃ সুজিত মিত্র লিখেছেন, "The site of the bite should be wiped but not incised because incision can aggravate bleeding, specially in bites causing non-clotting of blood damage to nerves and tendons, introduction of secondary infection and delay in healing." (p. 131)।

ওঝা গুনিনদের আমরা খুব সহজেই সমালোচনা করে থাকি—খুব বেশী হ'লে উদার আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বলে থাকি "ওদের প্রক্রিয়ার যদি আদৌ কোনো সুফল থাকে তবে তা শুধু রোগীর মনোবল বাড়ানো"। সেই সঙ্গে একথাও বলি, "শুধু এটুকুর জন্যে ওদের দ্বারস্থ হওয়া অবৈজ্ঞানিক

"সাপে কাটার বিজ্ঞানভিত্তিক প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে এ মুহূর্তে কিছুই বলতে পারছি না। সাপে কাটার চিকিৎসা ক্লাসে পড়ানো হয় নি। নিজেরাও পড়ি নি। ও থেকে আমাদের পরীক্ষায় কোনো প্রশ্ন আসে না।"
—কলকাতার একটি নামী মেডিক্যাল কলেজের এম. বি. বি. এস. পরীক্ষার ফাইনাল ইয়ারের কিছু ছাত্র।

অথচ "বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাপদ্ধতি" সাপে কাটার ব্যাপারে একদম মৌলিক প্রশ্নগুলিতে কত দিশাহারা! তাহলে বিজ্ঞানমনস্ক বিশেষজ্ঞ আর ওঝা গুণিনের ভিতর আমরা সাধারণ মানুষরা পার্থক্য টানবো কি নিরিখে? শুধু অ্যান্টিভেনমের? আর যারা অ্যান্টিভেনম পেল না তারা?

প্রাথমিক চিকিৎসা ডাক্তাররা করেন না, করেন জনগণ। সাপে কাটার প্রাথমিক চিকিৎসার কোনো **বিজ্ঞানভিত্তিক কাঠামো কি আদৌ আছে?** যদি থাকে, তাহলে গণবিজ্ঞানভাবনায় ভাবিত যেসব ব্যক্তি চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে পেশাগতভাবে যুক্ত, তাঁদের কাছে দাবি: সাপে কাটার প্রাথমিক চিকিৎসার **বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও প্রয়োগ-কৌশল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশ খুঁজে বার করুন এবং সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করুন।**□

[আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের পাঠ্যবইগুলো পড়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য গৌরাঙ্গ মালাকারের কাছে লেখক কৃতজ্ঞ।]

R. N. 34929/79
YEAR 12 NUMBER 1

A bi-monthly magazine
VIGYAN-O-VIGYANKARMI
c/o A. Lahiri
B2 BAISAKHI, 153/1 JESSORE ROAD, 700074
July-August, 1988

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করেছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে—অতিব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসেবে এই গ্রহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য। এবং এ সমস্তই ঘটবে আমাদের অপরিণামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে। নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই। প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৩২৩১/৮৮

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং সেন্টার, 18B ভুবন ধর লেন, কলি-12 থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত